প্রেমভক্তিপ্রকাশ

।। শ্রীপরমাত্মনে নমঃ ।।

প্রেমভক্তিপ্রকাশ

পরমাত্মার শরণপ্রাপ্ত পুরুষের মন পরমাত্মার নিকট প্রার্থনা করে—

হে প্রভু ! হে বিশ্বম্ভর ! হে দীনদয়াল ! হে কৃপাসিন্ধু ! হে অন্তর্যামী ! হে পতিতপাবন ! হে সর্বশক্তিমান ! হে দীনবন্ধু ! হে নারায়ণ ! হে হরি ! দয়া করুন, দয়া করুন। হে অন্তর্যামী ! জগতে আপনিই দয়াসিন্ধু এবং সর্বশক্তিমান বলে পরিচিত, এই কারণে দয়া করা তো আপনার কর্তব্য।

হে প্রভু ! যদি আপনার নাম পতিতপাবন হয়, তাহলে এক বার এসে দর্শন দিন। আমি আপনাকে বারংবার প্রণাম করে বিনত হয়ে বলছি, হে প্রভু ! দর্শন দিয়ে কৃতার্থ করুন। হে প্রভু ! আপনি ছাড়া এই সংসারে আমার আর কেউই নেই। একটি বার দর্শন দিন, দর্শন দিন প্রভু, আর উদ্বিগ্ন করবেন না ! আপনার নাম তো বিশ্বম্ভর, তাহলে কেন আমার আশাপূরণ করছেন না ? হে করুণাময় ! হে দয়াসাগর ! দয়া করুন। আপনি দয়ার সমুদ্র, তাই কিঞ্চিৎ দয়া করলে আপনার দয়াসাগরে দয়ার কোনো ঘাটতি হবে না। আপনার কিঞ্চিৎ দয়াতেই সম্পূর্ণ সংসারের উদ্ধার হতে পারে, সুতরাং একটি তুচ্ছ জীবের উদ্ধার আপনার পক্ষে এমন আর কী বড় কথা ! হে প্রভু ! যদি আপনি আমার কর্মের প্রতি দৃষ্টিপাত করেন, তাহলে তো এই সংসার থেকে আমার নিস্তার লাভ করার কোনো উপায়ই নেই। সেইজন্য আপনি আপনার পতিতপাবন নামের প্রতি দৃষ্টিপাত করে এই তুচ্ছ জীবকে

দর্শন দিন। আমি তো ভক্তির কিছুই জানি না, যোগও জানি না এবং এমন কোনো ক্রিয়াও জানি না যার দ্বারা আপনার দর্শন লাভ করতে পারি। আপনি অন্তর্যামী হয়েও যদি দয়াসিন্ধু না হতেন তাহলে আপনাকে এ জগতে কেউ দয়াসিন্ধু বলত না, যদি আপনি দয়ারসাগর হয়েও অন্তরের দুঃখ-কষ্ট না বুঝতেন তাহলে আপনাকে কেউ অন্তর্যামী বলত না। দুটি গুণের সঙ্গে যুক্ত হয়েও যদি আপনি সামর্থ্যবান না হতেন তাহলে আপনাকে কেউ সর্বশক্তিমান এবং সর্বসামর্থ্যবান বলত না। যদি আপনি কেবল ভক্তবৎসলই হতেন তাহলে আপনাকে কেউ পতিতপাবন বলত না। হে প্রভু ! হে দয়াসিন্ধু ! এক বার দয়া করে দর্শন দিন॥ ১ ॥

জীবাত্মা নিজের মনের উদ্দেশে বলে—

হে দুষ্ট মন ! কপট প্রার্থনা করলে কি অন্তর্যামী ভগবান প্রসন্ন হতে পারেন ? উনি কি জানেন না যে তোমার এই সমস্ত প্রার্থনা নিষ্কাম নয় ? এবং তোমার হৃদয়ে শ্রদ্ধা, বিশ্বাস এবং প্রেম কিছুই নেই ? যদি তোমার এই বিশ্বাস হয় যে ভগবান অন্তর্যামী, তাহলে কীসের জন্য প্রার্থনা করছ ? প্রেমহীন মিথ্যা প্রার্থনা করলে ভগবান কখনো শোনেন না এবং যদি প্রেম থাকে, তাহলে বলারই বা প্রয়োজন কী ? কারণ ভগবান তো স্বয়ং গীতাতে বলেছেন—

যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্। (৪।১১)

'যে আমাকে যেভাবে ভজনা করে, আমিও তাকে সেইভাবেই ভজনা করি।'

পুনরায় গীতায় অন্যত্র বলা হয়েছে—

যে ভজন্তি তু মাং ভক্ত্যা ময়ি তে তেষু চাপ্যহম্। (৯।২৯)

'যে (ভক্ত) আমাকে ভক্তিভাবে ভজনা করে, সে আমার মধ্যে বাস করে এবং আমিও তার মধ্যে প্রত্যক্ষভাবে প্রকট হয়ে থাকি।'[১]

---

[১]যেমন সূক্ষ্মরূপে সর্বত্র ব্যাপ্ত হয়েও অগ্নি সাধনদ্বারা প্রকট হলেই প্রত্যক্ষ হয়, তেমনই পরমেশ্বর সর্বত্র বিরাজমান হয়েও ভক্তিভাবে ভজনাকারীর অন্তঃকরণেই প্রত্যক্ষরূপে প্রকট হন।

হে মন ! হরি দয়াসিন্ধু হয়েও যদি দয়া না করেন তাহলেও কোনো চিন্তা নেই, তোমার তো নিজের কর্তব্যই করে যাওয়া উচিত। হরি তো প্রেমিক, তিনি বিশুদ্ধ প্রেমকে চিনতে পারেন। প্রেমের বিষয় তো প্রেমিকই জানেন, সেই অন্তর্যামী ভগবান কি তোমার শুষ্ক প্রেমে দর্শন দেবেন ? যখন বিশুদ্ধ প্রেম এবং শ্রদ্ধা-বিশ্বাসরূপী রজ্জু তৈরি হবে তখন সেই রজ্জুতে শ্রীহরি নিজে থেকেই বাঁধা পড়বেন। ওরে মূর্খ মন ! মিথ্যা প্রার্থনার দ্বারা কি কাজ উদ্ধার হবে ? কারণ হরি তো অন্তর্যামী। হে মন ! তোমাকে নমস্কার, তোমার কাজ তো সংসারে ডুবে থাকা, সুতরাং যেখানে তোমার ইচ্ছা হয় সেখানে যাও। তোমারই সঙ্গ করার ফলে আমি এই অসার সংসারে অনেক দিন ঘুরেছি, এখন হরির চরণকমলের আশ্রয় গ্রহণ করায় তোমার ছলনা সম্পূর্ণ জেনে গেছি, তুমি আমার জন্য কপটভাব এবং অতি দীন বচন দ্বারা ভগবানের কাছে প্রার্থনা করে থাকো। কিন্তু তুমি জানো না যে হরি অন্তর্যামী। যোগবাশিষ্ঠে ঠিকই লেখা আছে যে, মনের নাশ না হলে ভগবৎ প্রাপ্তি হয় না। বাসনা ক্ষয়, মনের নাশ এবং পরমেশ্বরের প্রাপ্তি—এই তিনটি একই সঙ্গে হয়ে থাকে। এইজন্য তোমাকে বিনীত ভাবে বলছি যে তুমি সসম্মানে এখান থেকে বিদায় হও। এখন আর এই পাখি তোমার মায়ারূপ ফাঁদে কখনো আবদ্ধ হবে না ; কারণ এ হরির চরণে আশ্রয় নিয়েছে। তুমি কি তাহলে নিজের দুর্দশা মেনে নেবে ? অহো ! কোথায় সেই মায়া ? কোথায় কাম-ক্রোধাদি শত্রুগণ ? এখন তো তোমার সম্পূর্ণ সেনা বিধ্বস্ত হয়ে যাচ্ছে, সুতরাং তোমার প্রভাব পড়বার আশা ত্যাগ করে যেখানে ইচ্ছা হয় চলে যাও॥ ২ ॥

মন পুনঃ পরমাত্মার নিকট প্রার্থনা জানাচ্ছে—

প্রভু ! দয়া করুন প্রভু। হে নাথ ! আমি আপনার শরণাগত। হে শরণাগত প্রতিপালক ! শরণাগতের লজ্জা রক্ষা করুন। হে প্রভু ! রক্ষা করুন, রক্ষা করুন, একবার আমায় দর্শন দিন। আপনি ছাড়া এই সংসারে আমার আর কোনো অবলম্বন নেই, অতএব আপনাকে বারংবার মিনতি করছি, প্রণাম করছি, আর বিলম্ব করবেন না, শীঘ্র এসে দর্শন দিন। হে প্রভু ! হে দয়াসিন্ধু ! একবার সশরীরে দাসের অবস্থা প্রত্যক্ষ করুন। আপনার অদর্শনে প্রাণের অন্য কোনো অবলম্বন দেখছি না। হে প্রভু ! দয়া করুন, দয়া করুন,

আমি আপনার শরণাগত, আমার প্রতি একবার দয়াদৃষ্টি নিক্ষেপ করুন। হে প্রভু ! হে দীনবন্ধু ! হে দীনদয়াল ! আর উদ্বিগ্ন করবেন না ; দয়া করুন। আমার দুষ্ট স্বভাবের প্রতি দৃকপাত না করে আপনার পতিতপাবন স্বভাবের প্রকাশ ঘটান॥ ৩ ॥

জীবাত্মা পুনঃ নিজের মনের উদ্দেশে বলে—

হে মন ! সাবধান ! সাবধান ! কীসের জন্য ব্যর্থ বিলাপ করছ। শ্রীসচ্চিদানন্দঘন হরি, মিথ্যা বিনতিতে বিগলিত হন না। তোমার কপটতা এখানে চলবে না। কেন তুমি আমার জন্য হরির কাছে কপট প্রার্থনা করো ? এইরকম প্রার্থনা আমি চাই না, তোমার যেখানে ইচ্ছা হয় সেখানে চলে যাও।

যদি হরি অন্তর্যামী হন, তাহলে প্রার্থনা করার কী আবশ্যকতা আছে ? যদি তিনি প্রেমী হন, তাহলে তাঁকে ডাকার কী আবশ্যকতা আছে ? যদি তিনি বিশ্বম্ভর হন, তাহলে চাইবার কী আবশ্যকতা আছে ? তোমাকে নমস্কার করি, তুমি এখান থেকে বিদায় নাও ; চলে যাও॥ ৪ ॥

জীবাত্মা নিজের বুদ্ধি এবং ইন্দ্রিয়দের উদ্দেশে জানাচ্ছে—

হে ইন্দ্রিয়গণ ! তোমাদের নমস্কার এবং বিদায় সম্ভাষণ জানাই। যেখানে বাসনা বিরাজ করে, সেখানেই তো তোমাদের অবস্থান। আমি শ্রীহরির চরণকমলে আশ্রয় নিয়েছি, এইজন্য এখন আর আমার উপর তোমাদের প্রভাব খাটবে না। হে বুদ্ধি ! তোমাকেও নমস্কার করি। পূর্বে তোমার জ্ঞান কোথায় চলে গিয়েছিল, যখন তুমি আমাকে সংসারে ডুবে যাওয়ার জন্য শিক্ষা দিয়েছিলে ? সেই শিক্ষা কী এখন আর কার্যকরী হতে পারবে ? ৫ ॥

জীবাত্মা পরমাত্মার উদ্দেশে জানাচ্ছে—

হে প্রভু ! আপনি অন্তর্যামী, সেইজন্য আমি বলছি না যে আপনি এসে দর্শন দিন। কারণ যদি আমার পূর্ণ প্রেম হত, তাহলে কি আপনি অপেক্ষা করতে পারতেন ? বৈকুণ্ঠে লক্ষ্মীও কি আপনাকে আটকাতে পারতেন ? যদি আপনার প্রতি আমার পূর্ণ শ্রদ্ধা থাকত, তাহলে আপনি কি বিলম্ব করতেন ? সেই প্রেম এবং বিশ্বাস কি আপনাকে ছাড়তে পারত ? অহো, বৃথাই আমি সংসারে নিষ্কাম এবং বাসনাহীন হয়ে রয়েছি এবং বৃথাই আমি নিজেকে আপনার শরণাগত বলে মানি। তবে কোনো চিন্তা নয়, যা কিছু পাওয়া যায়

তাতেই আমার প্রসন্ন থাকা উচিত। কারণ আপনি গীতাতে এই কথাই বলেছেন।[১] সেইজন্য আপনার চরণকমলের প্রেম-ভক্তিতে মগ্ন থেকে যদি আমার নরকপ্রাপ্তিও হয়, তাহলে সেটাও স্বর্গের চাইতে ভালো। এই যখন পরিস্থিতি তখন আমার কীসের চিন্তা ? যখন আপনার প্রতি আমার প্রেম উৎপন্ন হবে, তখন আপনার কি আমার প্রতি হবে না ? যখন আমি আপনার দর্শন ব্যতীত কিছুতেই থাকতে পারব না, তখন আপনিও কি দর্শন না দিয়ে থাকতে পারবেন ? আপনি তো স্বয়ং গীতাতে বলেছেন যে—

যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্। (৪।১১)

'যে আমাকে যেভাবে ভজনা করে, আমিও তাকে সেইভাবেই ভজনা করি।' সুতরাং আমি বলছি না যে আপনি এসে দর্শন দিন। এবং আপনারই বা কী দায় ? যাই হোক, কোনো চিন্তা নেই। আপনার যা ভালো মনে হয়, তাই করুন। আপনি যা করবেন, তাতেই আমার আনন্দিত হওয়া উচিত।। ৬ ।।

জীবাত্মা জ্ঞাননেত্রদ্বারা পরমেশ্বরের ধ্যান করতে করতে আনন্দে বিহ্বল হয়ে বলে ওঠে—

অহো ! অহো ! আনন্দ ! আনন্দ ! প্রভু ! প্রভু ! আপনি কি এসেছেন ? ধন্য ভাগ্য ! ধন্য ভাগ্য ! আজকে আমার মতন পতিতও আপনার চরণকমলের প্রভাবে কৃতার্থ হল। কেনই বা হবে না, আপনি তো স্বয়ং গীতাতে বলেছেন যে—

অপি চেৎ সুদুরাচারো ভজতে মামনন্যভাক্।
সাধুরেব স মন্তব্যঃ সম্যগ্ব্যবসিতো হি সঃ।।
ক্ষিপ্রং ভবতি ধর্মাত্মা শশ্বচ্ছান্তিং নিগচ্ছতি।
কৌন্তেয় প্রতিজানীহি ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যতি।। (৯।৩০-৩১)

'যদি (কোনো) অতিশয় দুরাচারীও অনন্যভাবে আমার ভক্ত হয়ে (নিরন্তর) আমার ভজনা করে, তবে তাকে সাধু বলেই মানা উচিত, কারণ সে সম্যক্‌রূপে উচিত সঙ্কল্পে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এইজন্য সেই ব্যক্তি শীঘ্রই ধর্মাত্মা হয়ে যায় এবং শাশ্বত শান্তিলাভ করে। হে কৌন্তেয় ! তুমি নিশ্চিত

---

[১]'যদৃচ্ছালাভসন্তুষ্টঃ' (গীতা ৪।২২), 'সন্তুষ্টো যেন কেনচিৎ' (গীতা ১২।১৯)

সত্যরূপে জেনো যে আমার ভক্ত কখনই বিনষ্ট হয় না'॥ ৭ ॥

জীবাত্মা পরমাত্মার আশ্চর্যজনক সগুণরূপ ধ্যানে দর্শন করে নিজের মনে তাঁর শোভার বর্ণনা করে বলে—

অহো ! ভগবানের চরণ যুগল কী সুন্দর, যা অসংখ্য নীলমণির জ্যোতি বিচ্ছুরিত করে অনন্ত সূর্যের মতো প্রকাশিত হচ্ছে। উজ্জ্বল নখ সমন্বিত, কোমল অঙ্গুলি শোভিত সেই চরণে রত্নখচিত স্বর্ণ নূপুর শোভা পাচ্ছে। ভগবানের চরণকমলের ন্যায় তাঁর জানু এবং জঙ্ঘাদি অঙ্গের দীপ্তি অসংখ্য নীলমণির জ্যোতির ন্যায় পীতাম্বর ভেদ করে বিচ্ছুরিত হচ্ছে। অহো ! তাঁর চারটি সুন্দর হাত কেমন শোভা বিস্তার করছে। উপরের দুটি হাতে শঙ্খ আর চক্র এবং নীচের দুটি হাতে গদা আর পদ্ম বিরাজিত। তাঁর চারটি হাতই বিবিধ সুন্দর আভরণে বিভূষিত। অহো ! ভগবানের বক্ষঃস্থল কত সুন্দর, যাতে লক্ষ্মীদেবী এবং মহর্ষি ভৃগুর চরণচিহ্ন বিরাজমান এবং নীলকমলের বর্ণযুক্ত ভগবানের গ্রীবাও কত সুন্দর, যেখানে রত্নখচিত হার ও কৌস্তুভমণি শোভা পাচ্ছে তথা মণিমুক্তা, বৈজয়ন্তীমালা, সুবর্ণের হারসমূহ এবং নানাবিধ পুষ্প মাল্যেও সেটি সুশোভিত। সুন্দর চিবুক, পদ্মরাগমণির ন্যায় ওষ্ঠ এবং ভগবানের অতিশয় সুন্দর নাসিকা, যার অগ্রভাগে মুক্তা বিরাজমান। ভগবানের দুটি চোখ কমলপত্রের ন্যায় বিশাল এবং প্রস্ফুটিত নীল পদ্মের শোভা বিস্তার করছে। তাঁর দুই কানে রত্নখচিত সুন্দর মকরাকৃতি কুণ্ডল, তাঁর ললাটে তিলকচিহ্ন এবং মস্তকে রত্নখচিত কিরীট (মুকুট) শোভা পাচ্ছে। অহো ! ভগবানের মুখারবিন্দ পূর্ণিমার চন্দ্রের মতো কতই মনোহর, যার চতুর্দিকে সূর্যের ন্যায় কিরণছটা দেদীপ্যমান এবং সেই জ্যোতির দ্বারা মুকুটাদি সমস্ত ভূষণের রত্নাদি উজ্জ্বলরূপে প্রকাশ পাচ্ছে। অহো ! আজ আমি ধন্য, সত্যি ধন্য যে মৃদু-মন্দ হাস্যময় আনন্দমূর্তি ভগবান শ্রীহরিকে দর্শন করছি॥ ৮ ॥

এইপ্রকার আনন্দে বিহ্বল হয়ে জীবাত্মা ধ্যানে তার সম্মুখে সোয়া হাত দূরে দ্বাদশ বর্ষীয় সুকুমার বালকের রূপে ভূমি থেকে সোয়া হাত ঊর্ধ্বে আকাশে বিরাজমান পরমেশ্বরকে দর্শন করে তাঁর মানসিক পূজার প্রস্তুতি নেয়।

মানসিক পূজার বিধি

ওঁ পাদয়োঃ পাদ্যং সমর্পয়ামি নারায়ণায় নমঃ॥ ১ ॥

এই মন্ত্র উচ্চারণ করে শুদ্ধ জল দ্বারা শ্রীভগবানের চরণকমলদ্বয় ধৌত করে সেই জল নিজের মস্তকে ধারণ করা॥ ১ ॥

ওঁ হস্তয়োরর্ঘ্যং সমর্পয়ামি নারায়ণায় নমঃ॥ ২ ॥

এই মন্ত্র উচ্চারণ করে ভগবান শ্রী হরির হস্তকমলে পবিত্র জল ছিটিয়ে দেওয়া॥ ২ ॥

ওঁ আচমনীয়ং সমর্পয়ামি নারায়ণায় নমঃ॥ ৩ ॥

এই মন্ত্র উচ্চারণ করে শ্রী নারায়ণদেবকে আচমন করিয়ে দেওয়া॥ ৩ ॥

ওঁ গন্ধং সমর্পয়ামি নারায়ণায় নমঃ॥ ৪ ॥

এই মন্ত্র উচ্চারণ করে ভগবান শ্রীহরির ললাটে তিলক লাগিয়ে দেওয়া॥ ৪ ॥

ওঁ মুক্তাফলং সমর্পয়ামি নারায়ণায় নমঃ॥ ৫ ॥

এই মন্ত্র উচ্চারণ করে শ্রীভগবানের ললাটে মুক্তো পরিয়ে দেওয়া॥ ৫ ॥

ওঁ পুষ্পং সমর্পয়ামি নারায়ণায় নমঃ॥ ৬ ॥

এই মন্ত্র উচ্চারণ করে শ্রীভগবানের মস্তকে এবং নাসিকার সামনে আকাশে ফুল সমর্পণ করা॥ ৬ ॥

ওঁ মাল্যং সমর্পয়ামি নারায়ণায় নমঃ॥ ৭ ॥

এই মন্ত্র উচ্চারণ করে শ্রীহরির গলায় ফুলের মালা পরিয়ে দেওয়া॥ ৭ ॥

ওঁ ধূপমাঘ্রাপয়ামি নারায়ণায় নমঃ॥ ৮ ॥

এই মন্ত্র উচ্চারণ করে শ্রীভগবানের সামনে অগ্নিতে ধূপ দেওয়া॥ ৮ ॥

ওঁ দীপং দর্শয়ামি নারায়ণায় নমঃ॥ ৯ ॥

এই মন্ত্র উচ্চারণ করে ঘৃতের প্রদীপ জ্বালিয়ে ভগবান শ্রীবিষ্ণুর সামনে রাখা॥ ৯ ॥

ওঁ নৈবেদ্যং সমর্পয়ামি নারায়ণায় নমঃ॥ ১০ ॥

এই মন্ত্র উচ্চারণ করে নৈবেদ্য দ্বারা ভগবান শ্রীহরিকে ভোগ নিবেদন করা॥ ১০ ॥

ওঁ আচমনীয়ং সমর্পয়ামি নারায়ণায় নমঃ॥ ১১ ॥

এই মন্ত্র উচ্চারণ করে শ্রীভগবানকে আচমন করিয়ে দেওয়া॥ ১১ ॥

ওঁ ঋতুফলং সমর্পয়ামি নারায়ণায় নমঃ॥ ১২ ॥

এই মন্ত্র উচ্চারণ করে ঋতুফল (কলা ইত্যাদি) দ্বারা শ্রীভগবানকে ভোগ নিবেদন করা॥ ১২ ॥

ওঁ পুনরাচমনীয়ং সমর্পয়ামি নারায়ণায় নমঃ॥ ১৩ ॥

এই মন্ত্র উচ্চারণ করে শ্রীভগবানকে আবার আচমন করিয়ে দেওয়া॥ ১৩॥

ওঁ পূগীফলং সতাম্বুলং সমর্পয়ামি নারায়ণায় নমঃ॥ ১৪ ॥

এই মন্ত্র উচ্চারণ করে সুপারিসহ পান শ্রীভগবানকে অর্পণ করা॥ ১৪ ॥

ওঁ পুনরাচমনীয়ং সমর্পয়ামি নারায়ণায় নমঃ॥ ১৫ ॥

এই মন্ত্র উচ্চারণ করে পুনঃ শ্রীহরিকে আচমন করিয়ে দেওয়া। তারপর সোনার থালায় কর্পূর জ্বেলে শ্রীনারায়ণদেবের আরতি করা॥ ১৫॥

ওঁ পুষ্পাঞ্জলিং সমর্পয়ামি নারায়ণায় নমঃ॥ ১৬ ॥

এই মন্ত্র উচ্চারণ করে সুন্দর-সুন্দর ফুল অঞ্জলি ভরে ভগবান শ্রীহরির মস্তকে নিবেদন করা॥ ১৬ ॥

তারপর চারবার প্রদক্ষিণ করে শ্রীনারায়ণদেবকে সাষ্টাঙ্গ দণ্ডবৎ-প্রণাম করা॥ ৯ ॥

উক্ত প্রকারে ভগবান শ্রীহরির মানসিক পূজা করার পর তাঁকে নিজ হৃদয়-আকাশে শয়ন করিয়ে জীবাত্মা নিজের মনেই শ্রীভগবানের স্বরূপ এবং গুণের বর্ণনা করতে করতে বারংবার মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম করে—

শান্তাকারং ভুজগশয়নং পদ্মনাভং সুরেশং
বিশ্বাধারং গগনসদৃশং মেঘবর্ণং শুভাঙ্গম্।
লক্ষ্মীকান্তং কমলনয়নং যোগিভির্ধ্যানগম্যং
বন্দে বিষ্ণুং ভবভয়হরং সর্বলোকৈকনাথম্॥

'যাঁর আকৃতি অতিশয় শান্ত, যিনি শেষনাগের শয্যায় শয়ন করে আছেন, যাঁর নাভি দেশে কমল আছে, যিনি দেবতাদেরও ঈশ্বর এবং সমগ্র জগতের আধার, যিনি আকাশ সদৃশ সর্বত্র ব্যাপ্ত, যাঁর বর্ণ নীল আকাশের

ন্যায়, যিনি সর্বাঙ্গ সুন্দর, যাঁকে যোগিগণ ধ্যান দ্বারা প্রত্যক্ষ করেন, যিনি সকল লোকের স্বামী এবং জন্ম-মরণরূপ ভয় নাশ করেন, সেই শ্রীলক্ষ্মীপতি কমলনেত্র ভগবান বিষ্ণুকে আমি মস্তক অবনত করে প্রণাম করি।'

অসংখ্য সূর্যের সমান যাঁর প্রকাশ, অনন্ত চন্দ্রমার সমান যাঁর শীতলতা, কোটি অগ্নির সমান যাঁর তেজ, অসংখ্য মরুদ্‌গণের সমান যাঁর পরাক্রম, অনন্ত ইন্দ্রের সমান যাঁর ঐশ্বর্য, কোটি কামদেবের সমান যাঁর সৌন্দর্য, অসংখ্য পৃথিবীর সমান যাঁর ক্ষমা, কোটি সমুদ্রের সমান যিনি গম্ভীর, যাঁকে কোনো প্রকারেরই উপমা দ্বারা বর্ণনা করতে পারা যায় না, বেদ এবং শাস্ত্রও যাঁর স্বরূপের কেবল কল্পনামাত্র করেছে, যাঁর আদি অন্ত কেউই পায়নি, এমন অনুপমেয় ভগবান শ্রীহরিকে আমি বারংবার নমস্কার করি।

সচ্চিদানন্দময় ভগবান শ্রীবিষ্ণু মৃদু-মন্দ হাস্যযুক্ত, যাঁর সকল অঙ্গের প্রতি রোমে স্বেদবিন্দুর চমক শোভা পাচ্ছে, সেই পতিতপাবন ভগবান শ্রীহরিকে আমার বারংবার নমস্কার।। ১০ ।।

জীবাত্মা নিজের মনে ভগবান শ্রীহরিকে পাখা দ্বারা হাওয়া করতে করতে এবং তাঁর চরণসেবা করতে করতে তাঁর স্তুতি করে বলছে—

অহো ! হে প্রভু ! আপনিই ব্রহ্মা, আপনিই বিষ্ণু, আপনিই মহেশ, আপনিই সূর্য, আপনিই চন্দ্রমা এবং তারকাগণ, আপনিই ভূঃ, ভুবঃ, স্বঃ—তিন লোক। সপ্তদ্বীপ এবং চতুর্দশ ভুবনাদি যা কিছুই বর্তমান, সব আপনারই স্বরূপ। আপনিই বিরাটস্বরূপ, আপনিই হিরণ্যগর্ভ, আপনিই চতুর্ভুজ এবং মায়াতীত শুদ্ধ ব্রহ্ম তো আপনিই। আপনিই অনেক রূপ ধারণ করে আছেন, এইজন্য সমস্ত সংসার তো আপনারই স্বরূপ। দ্রষ্টা, দৃশ্য, দর্শন যা কিছুই আছে, সে তো সব আপনিই।[১] অতএব—

---

[১]'একো বিষ্ণুর্মহদ্ভূতং পৃথগ্‌ভূতান্যনেকশঃ।' (বিষ্ণুসহস্রনাম ১৪০)

'পৃথক-পৃথক সমস্ত ভূতের উৎপাদক মহান ভূত এক বিষ্ণুই অনেক রূপে স্থিত আছেন।' তথা—

'একোঽহং বহু স্যাম্' (ইতি শ্রুতিঃ)

(সৃষ্টির আদিতে ভগবান সংকল্প করেছিলেন যে) 'একা আমিই বহু রূপ ধারণ করব'।

নমঃ সমস্তভূতানামাদিভূতায় ভূভৃতে।
অনেকরূপরূপায় বিষ্ণবে প্রভবিষ্ণবে॥

'সমস্ত প্রাণীদের আদিভূত পৃথিবীকে ধারণকারী এবং যুগে-যুগে আবির্ভূত হওয়া অনন্ত রূপধারী ভগবান বিষ্ণুর প্রতি নমস্কার।'

ত্বমেব মাতা চ পিতা ত্বমেব
ত্বমেব বন্ধুশ্চ সখা ত্বমেব।
ত্বমেব বিদ্যা দ্রবিণং ত্বমেব
ত্বমেব সর্বং মম দেবদেব॥

'আপনিই মাতা এবং আপনিই পিতা, আপনিই বন্ধু এবং আপনিই মিত্র, আপনিই বিদ্যা এবং আপনিই ধন (অর্থ) ; হে দেবদেব ! আপনিই আমার সর্বস্ব'॥ ১১ ॥

উক্ত প্রকারে পরমাত্মার প্রেম-ভক্তিতে নিমজ্জিত ভক্তের পরমাত্মার প্রতি যখন অতিশয় প্রেম জাগ্রত হয়, সেই সময়ে তার নিজের শরীরাদির প্রতি কোনো খেয়ালই থাকে না ; যেমন সন্ত সুন্দরদাসজী প্রেম-ভক্তির লক্ষণ নিরূপণ করতে গিয়ে বলেছেন—

ইন্দব ছন্দ

প্রেম লগ্যো পরমেশ্বরসোঁ, তব ভুলি গয়ো সিগরো ঘরবারা।
জ্যোঁ উন্মত্ত ফিরৈ জিত হী তিত, নেক রহী ন শরীর সঁভারা॥
শ্বাস উসাস উঠৈ সব রোম, চলৈ দৃগ নীর অখণ্ডিত ধারা।
সুন্দর কৌন করৈ নবধা বিধি, ছাকি পর্যৌ রস পী মতবারা॥

(পরমেশ্বরের প্রতি গাঢ় প্রেম জাগ্রত হলে, ভক্তের ঘরবাড়ির কথা মনে থাকে না। সে উন্মত্তের ন্যায় বিচরণ করে এবং শরীরের প্রতি খেয়ালই থাকে না। তার শ্বাস প্রশ্বাস দ্রুত বয়, তার দেহ রোমাঞ্চিত হতে থাকে এবং তার চোখ দিয়ে নিরবচ্ছিন্নভাবে জল পড়ে। সাধু সুন্দরদাসজী বলেছেন যে, এমতাবস্থায় নবধা ভক্তির পালন কে করবে ? সে তো কেবল এই রস পান করেই মাতোয়ারা হয়ে থাকে।)

নারাচ ছন্দ

ন লাজ তীন লোককী, ন বেদকো কহ্যো করৈ।
ন শংক ভূত প্রেতকী, ন দেব যক্ষতেঁ ডরৈ॥

সুনে ন কান ঔরকী, দ্রসৈ ন ঔর ইচ্ছনা।
কহৈ ন মুখ ঔর বাত, ভক্তি-প্রেম-লচ্ছনা॥

(তিন লোকের প্রতি তার ভ্রূক্ষেপ নেই, বেদের অনুশাসনের ঊর্ধ্বে তার অবস্থান। ভূত প্রেতের দ্বারা সে শঙ্কিত হয় না, দেব-যক্ষ হতেও সে ভীত নয়। অন্য কারোর কথায় তার ভ্রূক্ষেপ নেই এবং অন্য কোনো দিকে সে তাকিয়েও দেখে না। সে মুখে অন্য কথা বলে না, কেবল ভক্তি-প্রেমে আপ্লুত হয়ে নৃত্য করে।)

বীজুমালা ছন্দ

প্রেম অধীনো ছাক্যো ডোলৈ, ক্যোঁকী ক্যোঁহী বাণী বোলৈ।
জৈসে গোপী ভূলী দেহা, তৈসো চাহে জাঁসো নেহা॥

(সে প্রেম-রসে ডুবে থাকে। তার বাণী খুবই দুর্বোধ্য হয়। গোপীদের যেমন দেহবোধ ছিল না, তার চোখের দৃষ্টিও সেরকম নির্লিপ্ত ও নির্বোধ হয়)।

মন্‌হরণ ছন্দ

নীর বিনু মীন দুখী, ক্ষীর বিনু শিশু জৈসে,
পীরকী ওষধি বিনু, কৈসে রহ্যো জাত হৈ।
চাতক জ্যোঁ স্বাতিবুঁদ, চন্দকো চকোর জৈসে,
চন্দনকী চাহ করি, সর্প অকুলাত হৈ॥
নির্ধন জ্যোঁ ধন চাহে, কামিনীকো কন্ত চাহে,
এ্যসী জাকে চাহ তাহি, কছু ন সুহাত হৈ।
প্রেমকো প্রবাহ এ্যসো, প্রেম তঁহা নেম কৈসো,
সুন্দর কহত যহ প্রেমহীকী বাত হৈ॥

(সাধু সুন্দরদাসজী বলেছেন—জল ছাড়া মাছ যেমন মৃত্যুমুখে পতিত হয়, মায়ের দুধ না পেলে শিশু যেমন দুঃখী হয়, তেমনই ব্যথায় ঔষধ ব্যতীত কী করে থাকা যায় ! চাতক স্বাতী বিন্দুর জন্য ততটাই আকুল, যতটা চকোর চাঁদের জন্য হয়। চন্দনের কামনায় সাপ যেমন আকুল হয়, নির্ধন যেমন ধনের কামনা করে, কামী পুরুষ যেমনভাবে নারীসঙ্গ কামনা করে—এমন যার আকুলতা, তার অন্য কিছুতেই তৃপ্তি হয় না। প্রেমের প্রবাহ এমনই, প্রেমের জোয়ারে সকল নিয়মের বাঁধন আলগা হয়ে যায়। দিব্য

প্রেমের কথাই আলাদা!)

ছপ্পয় ছন্দ

কবহুঁক হাঁসি উঠি নৃত্য করৈ, রোবন ফির লাগে।
কবহুঁক গদ্‌গদ কণ্ঠ, শব্দ নিকসে নহিঁ আগে॥
কবহুঁক হৃদয় উমঙ্গ, বহুত উঁচে স্বর গাবে।
কবহুঁক হ্বৈ মুখ মৌন, গগন এ্যসে রহি জাবে॥
চিত্ত-বিত্ত হরিসোঁ লগ্যো, সাবধান কৈসে রহে।
য়হ প্রেমলক্ষণা ভক্তি হৈ, শিষ্য সুনহু সুন্দর কহৈ॥ ১২ ॥

(কখনো হেসে উঠে নৃত্য করে, পরক্ষণেই রোদন করে। কখনো গদ্‌গদ হয়ে যায়, কোনো শব্দ নির্গত হয় না। কখনো হৃদয়ে উচ্ছ্বাস এলে খুব উচ্চস্বরে গান গায়। কখনো মৌন হয়ে যায়, পূর্ববৎ নিস্তব্ধতা বিরাজ করে। যখন সে চিত্ত-বিত্ত সবই হরিকে অর্পণ করেছে, তখন সে সাবধান কেমন করে হবে ? সাধু সুন্দরদাসজী মহারাজ বলেছেন, শোনো শিষ্য ! এই হল প্রেমলক্ষণা ভক্তির নিদর্শন।)

সগুণ ভগবান অন্তর্ধান করার পর, জীবাত্মা শুদ্ধ সচ্চিদানন্দময় সর্বব্যাপী পরব্রহ্ম পরমাত্মার স্বরূপে মগ্ন হয়ে বলে—অহো ! আনন্দ ! আনন্দ ! অতি আনন্দ ! সর্বত্র একমাত্র বাসুদেবই ব্যাপ্ত আছেন[১]। অহো ! সর্বত্র কেবল আনন্দেই পরিপূর্ণ।

কোথায় কাম, কোথায় ক্রোধ, কোথায় লোভ, কোথায় মোহ, কোথায় মদ, কোথায় মাৎসর্য, কোথায় মান, কোথায় ক্ষোভ, কোথায় মায়া, কোথায় মন, কোথায় বুদ্ধি, কোথায় ইন্দ্রিয়গণ, সর্বত্র এক সচ্চিদানন্দই ব্যাপ্ত আছেন। অহো ! অহো ! সর্বত্র এক সত্যরূপ, চেতনরূপ, আনন্দরূপ, ঘনরূপ, পূর্ণরূপ, জ্ঞানস্বরূপ, কূটস্থ, অক্ষর, অব্যক্ত, অচিন্ত্য, সনাতন, পরব্রহ্ম, পরম অক্ষর, পরিপূর্ণ, অনির্দেশ্য, নিত্য সর্বগত, অচল, ধ্রুব,

---

[১]বহূনাং জন্মনামন্তে জ্ঞানবান্মাং প্রপদ্যতে।
বাসুদেবঃ সর্বমিতি স মহাত্মা সুদুর্লভঃ॥ (গীতা ৭।১৯)

'বহু জন্মের পর শেষ জন্মে যে তত্ত্বজ্ঞান প্রাপ্ত জ্ঞানী 'সব কিছুই বাসুদেব', এই জ্ঞানে আমাকে ভজনা করে, সেই (সেইরূপ) মহাত্মা অতি দুর্লভ।'

অগোচর, মায়াতীত, অগ্রাহ্য, আনন্দ, পরমানন্দ, মহানন্দ, কেবল আনন্দ, আনন্দ, আনন্দই পরিপূর্ণ হয়ে আছেন, আনন্দ ছাড়া কিছুই নেই॥ ১৩ ॥

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ

———○———

রাগ ভৈরবী—রূপক তাল

বন্দৌঁ বিষ্ণু বিশ্বাধার॥
লোকপতি, সুরপতি, রমাপতি, সুভগ শান্তাকার॥
কমল-লোচন কলষুহর কল্যাণ পদ-দাতার॥
নীল নীরদ-বর্ণ নীরজ-নাভ নভ অনুহার॥
ভৃগুলতা-কৌস্তুভ সুশোভিত হৃদয় মুক্তাহার॥
শঙ্খ চক্র গদা কমলযুত ভুজ বিভূষিত চার॥
পীত-পট পরিধান পাবন অঙ্গ অঙ্গ উদার॥
শেষ শয্যা-শায়িত, যোগী-ধ্যান-গম্য, অপার॥
দুঃখময় ভব-ভয়-হরণ, অশরণ-শরণ অবিকার॥

———○———

সর্বরূপে ভগবান

জয় জগদীশ হরে, প্রভু! জয় জগদীশ হরে।
মায়াতীত, মহেশ্বর মন-বচ-বুদ্ধি পরে॥ টেক
আদি, অনাদি, অগোচর, অবিচল, অবিনাশী।
অতুল, অনন্ত, অনাময়, অমিত, শক্তি-রাশী॥ ১ ॥ জয়.
অমল, অকল, অজ, অক্ষয়, অব্যয়, অবিকারী।
সত-চিত-সুখময় সুন্দর, শিব সত্তাধারী॥ ২ ॥ জয়.
বিধি-হরি-শংকর-গণপতি-সূর্য-শক্তিরূপা।
বিশ্ব চরাচর তুম হী, তুম হী জগভূপা॥ ৩ ॥ জয়.
মাতা-পিতা-পিতামহ-স্বামী-সুহৃদ ভর্তা।
বিশ্বোৎপাদক পালক রক্ষক সংহর্তা॥ ৪ ॥ জয়.
সাক্ষী, শরণ, সখা, প্রিয়, প্রিয়তম, পূর্ণ প্রভো।
কেবল-কাল কলানিধি, কালাতীত, বিভো॥ ৫ ॥ জয়.
রাম-কৃষ্ণ, করুণাময়, প্রেমামৃত-সাগর।
মন-মোহন মুরলীধর, নিত-নব নটনাগর॥ ৬ ॥ জয়.
সব বিধি হীন, মলিন-মতি, হম অতি পাতকি-জন।
প্রভুপদ-বিমুখ অভাগী, কলি-কলুষিত তন-মন॥ ৭ ॥ জয়.
আশ্রয়-দান দয়ার্ণব ! হম সবকো দীজৈ।
পাপ-তাপ হর হরি ! সব, নিজ-জন কর লীজৈ॥ ৮ ॥ জয়.

॥ শ্রীহরিঃ ॥

ধ্যানাবস্থায় প্রভুর সঙ্গে বার্তালাপ

সাধক একান্তে এবং পবিত্র স্থানে কুশের বা পশমের আসনে স্বস্তিক, সিদ্ধ অথবা পদ্মাসন ইত্যাদি যে কোনো আসনে স্থিরভাবে সোজা হয়ে এবং সুখপূর্বক উপবেশন করে বিষয়াদি থেকে ইন্দ্রিয়গণকে সংযত করে সমস্ত সাংসারিক কামনা ত্যাগ করে সংকল্পরহিত হবেন। তারপর আলস্যরহিত হয়ে বৈরাগ্যযুক্ত পবিত্র চিত্ত দ্বারা নিজ ইষ্টদেব ভগবানকে আহ্বান করবেন। এটি খেয়াল রাখতে হবে যে ভগবান যখন ধ্যানাবস্থায় আসেন তখন চিত্তে খুব প্রসন্নতা, শান্তি, জ্ঞানের দীপ্তি এবং নেত্র মুদিত হলেও সর্বত্র এক দিব্য প্রকাশ প্রত্যক্ষের মতন প্রতীত হয়। যেখানে শান্তি বিরাজ করে, সেখানে বিক্ষেপ হয় না এবং যেখানে জ্ঞানের দীপ্তি প্রকাশ পায়, সেখানে নিদ্রা-আলস্য আসতে পারে না। এই বিশ্বাস রাখা উচিত যে ভগবানের উদ্দেশে স্তুতি, প্রার্থনা করলে ভগবান ধ্যানাবস্থায় আবির্ভূত হন। নিজ ইষ্টদেবকে সাকাররূপে ধ্যান করায় কোনো অসুবিধাও হয় না। যদি বলা হয় যে দেখা বস্তুর ধ্যান করা তো সহজ, কিন্তু অদেখা বস্তুর ধ্যান কী করে হতে পারে ? কথাটা তো ঠিক ; কিন্তু শাস্ত্র এবং মহাত্মাদের বাণীর ভিত্তিতে এবং নিজ ইষ্টদেবের পছন্দ মতো কোনো এক চিত্রকে অবলম্বন করেও ধ্যান হতে পারে। এইজন্য সাধকের উচিত চক্ষু মুদ্রিত করে নিজ ইষ্টদেব পরমেশ্বরকে আহ্বান করা এবং সাধারণ আহ্বানে তিনি সাড়া না দিলে তাঁর নাম ও গুণের কীর্তন এবং দিব্য স্তোত্র ও পদাবলী দ্বারা স্তুতি ও প্রার্থনা করে শ্রদ্ধা ও প্রেমপূর্বক করুণাভাবের দ্বারা আপ্লুত হয়ে ভগবানকে পুনঃপুন আর্তভাবে ডাকা এবং ভগবানের আগমনের প্রতীক্ষা করে এই চৌপাইটি উচ্চারণ করা—

এক বাত মৈঁ পূছহু তোহী। কারন কবন বিসারেহু মোহী।।

তারপর এই বিশ্বাস করা উচিত যে আমার ইষ্টদেব ভগবান, আকাশে আমার সম্মুখে মাত্র দুই ফুটের দূরত্বে প্রত্যক্ষরূপে দণ্ডায়মান। তারপর চরণ থেকে শুরু করে মস্তক পর্যন্ত সেই দিব্য মূর্তিকে অবলোকন করে এই

চৌপাই পাঠ করা উচিত—

নাথ সকল সাধন মৈঁ হীনা। কীন্হী কৃপা জানি জন দীনা॥

হে নাথ ! আমি তো একেবারে সম্পূর্ণ সাধনহীন, তবুও আপনি আমাকে দয়া করেছেন অর্থাৎ আমি তো এমন কোনোই সাধনা করিনি যার বলে ধ্যানেও আপনার দর্শন লাভ করতে পারি। কিন্তু আপনি আমাকে দীন জেনেই ধ্যানে দর্শন দিয়েছেন। এইভাবে ভগবানের আগমনের পর সাধক ধ্যানাবস্থায় ভগবানের সঙ্গে বার্তালাপ শুরু করে।

সাধক—প্রভু ! আপনি ধ্যানাবস্থায়ও প্রকট হতে এত বিলম্ব কেন করেন ? ডাকার সঙ্গে সঙ্গেই আপনি কেন আসেন না ? এত ব্যাকুল করে তোলেন কেন ?

ভগবান—এই ব্যাকুলতার মধ্যেই তোমার পরম মঙ্গল নিহিত আছে।

সা.—নিরন্তর এই আকুলতার মধ্যে কী মঙ্গল আছে, আমি তা বুঝি না। আমি তো আপনার আগমনকেই মঙ্গলজনক বলে বুঝি।

ভ.—বিলম্ব করে এলে বিশেষ লাভ হয়। যখন বিরহ ব্যাকুলতা এবং ইচ্ছা তীব্র হয়, সেই সময় এলে অত্যন্ত আনন্দ হয়। যেমন অতিশয় ক্ষুধা পেলে অন্ন অমৃতের সমান লাগে।

সা.—ঠিক আছে, কিন্তু খুব বিলম্ব করে এলে সাধক হয়তো নিরাশ হয়ে ধ্যান ছেড়েও দিতে পারে।

ভ.—যদি সাধকের আমার প্রতি এইটুকুও বিশ্বাস না থাকে এবং আমার আগমনে বিলম্ব হওয়ার কারণে যে সাধক নিরাশ হয়ে ধ্যান ছাড়তে পারে, তাকে দর্শন দিয়ে কী লাভ হবে।

সা.—ঠিক আছে, কিন্তু আপনি এলে আপনার প্রতি আগ্রহ তো বাড়বেই এবং তার ফলে সাধনও প্রাণবন্ত হবে, এইজন্য ডাকার সঙ্গে সঙ্গেই আপনার আসা উচিত।

ভ.—উচিত তো সেটাই যা আমি মনে করি এবং আমি সেটাই করি, যেটা করা উচিত।

সা.—প্রভু ! আপনি যেমন বলছেন, আমার ঠিক তেমনই মানা উচিত।

কিন্তু মন বড়ই অবাধ্য ; সে মানতে দেয় না। আপনার কথা তো ঠিকই, তা সত্ত্বেও আমার তো এটাই ভালো লাগে যে আমি আপনাকে স্মরণ করব আর তৎক্ষণাৎ আপনি চলে আসবেন। এখন বলে দিন এমন কোন্ উপায় আছে, যে একবার মাত্র স্মরণ করার সঙ্গে সঙ্গেই আপনি চলে আসতে পারেন ?

ভ. — যখন সাধক গোপীদের মতন আমারই জন্য বিরহে কাতর হয় তখন তৎক্ষণাৎ চলে আসতে পারি অথবা দ্রৌপদী এবং গজেন্দ্রর মতন আমার প্রতি প্রেম এবং বিশ্বাস রেখে দুর্দশায় ব্যাকুল হয়ে যখন ডাকে, সেই অবস্থায় আমি তৎক্ষণাৎ চলে আসতে পারি। অথবা প্রহ্লাদের মতন নিষ্কাম ভাবে ভজনাকারীর জন্য, না ডাকা সত্ত্বেও চলে আসতে পারি।

সা. —বিরহে ব্যাকুল করে তারপর আসেন, এটা আপনার কেমন স্বভাব ? আপনি বিরহ বেদনা দিয়ে কষ্ট কেন দেন ?

ভ. — বিরহজনিত ব্যাকুলতা তো খুবই উচ্চ স্থিতি। বিরহ ব্যাকুলতায় প্রেমের বৃদ্ধি হয়, তখন ভক্ত একটি ক্ষণের জন্যও বিয়োগ সহ্য করতে পারে না। সে চিরকালের জন্য আমাকে প্রাপ্ত হয়। একবার মিলন হওয়ার পর, আর কখনো সে আমাকে ছাড়ে না। যেমন, ভরত চতুর্দশ বৎসর পর্যন্ত বিরহে ব্যাকুল ছিল, তারপর আমার সঙ্গ সে কখনো ছাড়েনি।

সা.—আপনার কখনো প্রয়োজন হলে তো আপনি প্রায়ই লক্ষ্মণ এবং শত্রুঘ্নকেই আদেশ করতেন, ভরতকে নয় ; এর কারণ কী ছিল ?

ভ.—প্রেমের আধিক্যের জন্য ভরত আমার বিয়োগ সহ্য করতে পারত না।

সা.—তাহলে তিনি চতুর্দশ বৎসর ধরে কী করে বিয়োগ সহ্য করলেন ?

ভ. — আমার আজ্ঞা অনুযায়ী বাধ্য হয়েই তাকে বিয়োগ সহ্য করতে হয়েছিল এবং সেই বিরহের দরুণ প্রেমের এত প্রাবল্য হয়েছিল যে এরপর আমার সঙ্গে ওর কখনো বিয়োগ হয়নি।

সা.—কিন্তু সেই বিরহের মধ্যে আপনি ভরতের জন্য হিতকর কী ভেবেছিলেন ?

ভ. —চতুর্দশ বৎসর বিরহ সহ্য করায় সে বিরহ এবং মিলনের তত্ত্ব

জেনে গিয়েছিল। তার ফলে ক্ষণমাত্রের বিয়োগও তার কাছে এক যুগের সমান বলে মনে হত। যদি এমন না হত, তাহলে আমার প্রতি তার এত আকর্ষণ কী করে হত ?

সা.—বিরহ ব্যাকুলতার দরুণ নিরাশাও তো হতে পারে ?

ভ.—আমি তো আগেই বলেছি যে এমন ব্যক্তিকে তাহলে দর্শন দিয়ে কী প্রয়োজন সিদ্ধ হবে ?

সা.—তাহলে আপনার দর্শনের জন্য এমন ব্যক্তির কী করা উচিত ?

ভ.—যেন তেন প্রকারে আমার প্রতি শ্রদ্ধা এবং প্রেমের যাতে বৃদ্ধি হয়, সেরকম চেষ্টা করা উচিত।

সা.—শ্রদ্ধা এবং প্রেম ব্যতীত কি দর্শন আদৌ সম্ভব নয় ?

ভ.—না, সম্ভব নয়, এটাই হল নীতি অর্থাৎ নিয়ম।

সা.—এর থেকে রেহাই দিতে পারেন না ?

ভ.—কাউকে রেহাই দিলে আর কাউকে না দিলে তো বিষমতার দোষ উৎপন্ন হয়। সকলকে রেহাই দেওয়া সম্ভবই নয়।

সা.—এমন রেহাই (বিশেষ ছাড়) দেওয়া কী কখনো সম্ভবপর হয় ?

ভ.—হ্যাঁ, অন্তকালের জন্য এমন রেহাই বরাদ্দ আছে। সেই সময়ে শ্রদ্ধা ও প্রেম না হলেও কেবল আমায় স্মরণ করলেই আমাকে লাভ করা যায়।

সা.—তাহলে এক্ষেত্রে এই বিশেষ রেহাই দেওয়ার ব্যবস্থা কেন করা হয়েছে ?

ভ.—তার জীবন সমাপ্ত হয়ে যাচ্ছে। সে চিরকালের জন্য এই মনুষ্য-শরীর ত্যাগ করে চলে যাচ্ছে। এইজন্য এই বিশেষ রেহাই দেওয়ার ব্যবস্থা তার জন্য করা হয়েছে।

সা.—জীবনের এই শেষ ক্ষণের জন্য এই বিশেষ রেহাই তো দেওয়াই উচিত। কিন্তু শেষ সময়ে তো মন, বুদ্ধি, ইন্দ্রিয়াদি নিজের বশে থাকে না ; অতএব সেই সময় আপনাকে স্মরণ করাও নিজের ইচ্ছাধীন ব্যাপার নয়।

ভ.—এইজন্য সর্বদা আমাকে স্মরণ রাখার অভ্যাস করা উচিত। যে এইরকম অভ্যাস করবে, তার আমার স্মৃতি অবশ্যই হবে।

সা.—আমি তো চাই যে আপনার স্মৃতি আমার মধ্যে সদা জাগরিত থাকুক এবং সে চেষ্টাও করি, কিন্তু চঞ্চল এবং উন্মত্ত মনের কাছে আমার সব চেষ্টা বিফল হয়। এর জন্য কী উপায় করা উচিত ?

ভ.— তোমার মন যেখানে যেখানে যায়, সেইসব স্থান থেকে তাকে ফিরিয়ে এনে প্রীতিপূর্ণভাবে বুঝিয়ে বার-বার আমাতেই মগ্ন হওয়া উচিত অথবা আমি সর্বত্রই বিরাজিত এই ভেবে যেখানে যেখানে মন যায় সেখানে আমারই চিন্তা করা উচিত।

সা.—এই কথা আমি শুনেছি, পড়েছি এবং আমি তা বুঝিও ; কিন্তু সেই সময় এইসব উপায় তো আমার মনে থাকে না, এইজন্য আপনাকে স্মরণ করতে পারি না।

ভ.—তোমার এই কু-অভ্যাস তো আসক্তির কারণেই হয়েছে। এই আসক্তি নাশ এবং অভ্যাস সংশোধনের জন্য তোমার মহাপুরুষদের সঙ্গ এবং নামজপের অভ্যাস করা উচিত।

সা.—সেটা তো খুব অল্প পরিমাণে করাও হয়ে থাকে এবং এর দ্বারা লাভও হয় ; কিন্তু আমার দুর্ভাগ্য যে সেটাও তো সব সময় হয়ে ওঠে না।

ভ.—এর মধ্যে দুর্ভাগ্যের কী আছে ? এতে তো তোমার চেষ্টার ঘাটতি দায়ী ?

সা.—প্রভু ! ভজন এবং সৎসঙ্গ কি চেষ্টা দ্বারা হয় ? শুনেছি যে পূর্বকৃত পুণ্য একত্র হলে তবেই নাকি সৎসঙ্গ হয়।

ভ.—আমার এবং সৎপুরুষদের আশ্রয় নিয়ে ভজনের যে চেষ্টা করা হয় তা অবশ্যই সফল হয়। তাতে কুসঙ্গ, আসক্তি ও সঞ্চিতকর্ম বাধা সৃষ্টি করে ; কিন্তু এর তীব্র অভ্যাসের দ্বারা সমস্ত বাধার নাশ হয় এবং উত্তরোত্তর সাধনের উন্নতি হয়ে শ্রদ্ধা ও প্রেমের বৃদ্ধি হয় এবং তারপর বাধা-বিঘ্ন আর ধারে কাছেও আসতে পারে না। প্রারব্ধ কেবল পূর্বজন্মে কৃত কর্ম অনুযায়ী ফল ভোগ করায়, কিন্তু নতুন শুভ কর্ম করায় কোনো বাধা দিতে পারে না। যে সমস্ত বাধা উপস্থিত হয়, তা সাধকের দুর্বলতার জন্য হয়। পূর্বসঞ্চিত পুণ্য ছাড়াও শ্রদ্ধা এবং প্রেমপূর্বক চেষ্টা করলেও আমার কৃপায় সৎসঙ্গ লাভ হতে পারে।

সা.—প্রভু ! অনেক লোক আছে যারা সৎসঙ্গ করার চেষ্টা করে, কিন্তু যখন সৎসঙ্গ লাভ হয় না, তখন তারা ভাগ্যের নিন্দা করে থাকে। এটা কি ঠিক ?

ভ.—তা তো ঠিক, কিন্তু এতে নিজেকে প্রবঞ্চনা করা হতে পারে এবং সাধনায় শিথিলতা এসে যায়। যতটা প্রযত্ন করা উচিত, ততটা করার পরও যদি সৎসঙ্গ না হয় তখন এমন ধারণা করা যেতে পারে, কিন্তু এই বিষয়ে প্রারব্ধের নিন্দা না করে নিজের মধ্যে শ্রদ্ধা এবং প্রেমের যা ন্যূনতা আছে তারই নিন্দা করা উচিত ; কারণ শ্রদ্ধা এবং প্রেমের দ্বারা নতুন প্রারব্ধ তৈরি হয়েও পরম কল্যাণকারক সৎসঙ্গ লাভ হতে পারে।

সা.—প্রভু ! আপনি সৎসঙ্গের এত গুণগান কেন করেন ?

ভ.— সৎসঙ্গ ছাড়া তো ভজন, ধ্যান, সেবাদির সাধন হয়ই না এবং আমার প্রতি প্রেমও হতে পারে না। সৎসঙ্গ ব্যতীত আমাকে লাভ করা কঠিন। এইজন্য আমি সৎসঙ্গের এত গুণগান করে থাকি।

সা.—প্রভু ! বলে দিন, সৎসঙ্গ লাভ করার উপায় কী ?

ভ. —আমি তো আগেই এর উপায় বলেও দিয়েছি যে শ্রদ্ধা এবং প্রেমপূর্বক সৎসঙ্গের জন্য চেষ্টা করার পর আমার কৃপায় সৎসঙ্গ লাভ হতে পারে।

সা.—এখন আমি সৎসঙ্গ লাভের জন্য আরও বেশি করে চেষ্টা করব। আপনার কাছেও আমি নিষ্কাম প্রেমপূর্বক নিরন্তর ভজন-ধ্যানের জন্য সাহায্য চাইছি।

ভ.— তুমি নিজের বুদ্ধি অনুসারে তো ঠিকই চাইছ, কিন্তু ভজন-ধ্যান তোমার মনের ততটা ভালো লাগে না যতটা বিষয় ভোগ ভালো লাগে।

সা.—হ্যাঁ, বুদ্ধিপূর্বক তো আমি তাই চাই, কিন্তু মন তো বড়ই দুষ্ট। তবে ভজন-ধ্যানে রুচি কম হওয়ার দরুণ যদি তার (মনের) ভজন-ধ্যান ভালো না লাগে, তাহলে সেখানে তো আমি নিরুপায়। এইজন্যেই আপনার বিশেষভাবে সাহায্য করা উচিত।

ভ.—মনের যদি ভজন-ধ্যানের প্রতি আস্থা কম হয়, তাহলেও এই চেষ্টা

করতে থাকো যাতে সে ভজন-ধ্যানে নিয়োজিত থাকে। ধীরে-ধীরে তাতে রুচি হবে এবং ফলে ভজন-ধ্যান ঠিকমতন হওয়া সম্ভব।

সা.—আমি সাধ্য অনুযায়ী চেষ্টা করে যাচ্ছি, কিন্তু এখন অবধি সন্তোষ জনক কিছুই হয়নি। এইজন্যই তো আমার উৎসাহ ভঙ্গ হয়ে যায়। আমার তো এটাই বিশ্বাস যে আপনার দয়াতেই এই কাজ হওয়া সম্ভব। সুতরাং আপনার বিশেষভাবে দয়া করা উচিত।

ভ.—উৎসাহহীন হওয়া উচিত নয়। আমার ওপর ভার দিলে সব কিছু সম্ভব হয়। কথাটা তো ঠিকই, কিন্তু দৃঢ়সংকল্প হয়ে আমার আজ্ঞানুসারে চলার চেষ্টাও তো তোমার করা উচিত। এমন মনে কোরো না যে তোমার সমস্ত রকম চেষ্টা করা হয়ে গেছে, কারণ এখনও চেষ্টা করার মধ্যে অনেক ন্যূনতা রয়ে গেছে। তোমার শক্তি অনুসারে এখনও তো চেষ্টা অনেক বাকী। এইজন্য খুব তৎপরতার সঙ্গে চেষ্টা করা উচিত।

সা.—আপনার আশ্রয় নিয়ে আরও চেষ্টা করার উদ্যোগ করব ; কিন্তু কাজ তো আপনার দয়াতেই হবে।

ভ.—এটা তো তোমার অনুরাগের কথা যে তুমি আমার ওপর বিশ্বাস রাখো ; কিন্তু সাবধান থেকো যাতে ভুলবশত কখনো প্রমাদ না আসে। আমি বলছি যে তোমার উৎসাহ বাড়ানো উচিত। যখন আমার এটাই বক্তব্য, তখন তো তোমার উৎসাহে ঘাটতি হওয়ার কোনোই কারণ নেই। কেবল মনই তোমাকে ধোঁকা দিচ্ছে। উৎসাহ-ভঙ্গ হওয়ার কথা কখনো মনে আসতে দিও না, সবসময় উৎসাহ রেখো।

সা.—শান্তি এবং প্রসন্নতা না হওয়ায় আমার উৎসাহ শিথিল হয়ে পড়ে।

ভ.—যখন তুমি আমার ওপর ভরসা রাখো, তাহলে কাজের সফলতার প্রতি কেন দৃষ্টি দাও ? সেটাও তো একধরনের কামনা।

সা.—কামনা তো বটেই, কিন্তু সেটা তো কেবল ভজন-ধ্যানের বৃদ্ধির জন্যেই।

ভ.—যখন তুমি আমার শরণাগত হয়ে গেছ, তখন ভজন-ধ্যান বৃদ্ধির

জন্য শান্তি ও প্রসন্নতার চিন্তা তোমার হওয়া উচিত নয়। কেবল আমার আজ্ঞা পালন করার প্রতি তোমার বিশেষ মনোযোগ দেওয়া উচিত। কাজের ফলের প্রতি নয়।

সা.—কাজ সফল না হলে উৎসাহ-ভঙ্গ হবে এবং উৎসাহ-ভঙ্গ হওয়ার দরুন ভজন-ধ্যান হবে না।

ভ.—এটা তো ঠিক কথা, কিন্তু সফলতার ন্যূনতা দেখেও নিরুৎসাহ না হওয়াই উচিত। আমার ওপর বিশ্বাস রেখে, আমার আজ্ঞানুসারে উত্তরোত্তর উৎসাহ বাড়ানো উচিত।

সা. —এই কথাটা ঠিক এবং যুক্তিসংগত, কিন্তু তবুও শান্তি এবং প্রসন্নতা না পাওয়ার জন্য উৎসাহে ঘাটতি হয়েই যায়।

ভ.—যদি এরকম হয়, তাহলে তুমি আমার কথার প্রতি কোথায় আস্থা রাখলে ? এটি তো কেবল তোমার মনের ধোঁকা ছাড়া কিছুই নয়।

সা.—প্রভু ! আমার সঞ্চিত পাপ কি এর কারণ নয় ? আমার উৎসাহে কি তা বাধা সৃষ্টি করছে না ?

ভ.—পরিপূর্ণভাবে আমার শরণাগত হওয়ার পর পাপের আর কোনো অবশেষ থাকে না।

সা.—এটা তো আমি জানি, কিন্তু বাস্তবে আমি সম্পূর্ণরূপে আপনার শরণাগত কোথায় হতে পেরেছি ? এখন পর্যন্ত তো আমি কেবলমাত্র মুখের কথায় আপনার শরণাগত হয়েছি।

ভ.—কেবলমাত্র বাক্যের দ্বারাও যে একবার আমার শরণাগত হয়ে যায়, তাকেও আমি পরিত্যাগ করি না। কিন্তু তোমার তো নিজের ভাব অনুযায়ী আমার শরণাগত হওয়ার জন্য খুব চেষ্টা করা উচিত।

সা.—চেষ্টা তো খুবই করি, কিন্তু মনের কাছে আমার কিছুই খাটে না।

ভ.—খুব চেষ্টা করি, এই ধারণাটা ভুল। চেষ্টা তো অল্প মাত্রায় করো, কিন্তু সেটাই তোমার বেশি বলে ধারণা হয়।

সা.—এই ধারণা সংশোধন করার জন্য আমি বিশেষভাবে চেষ্টা করব, কিন্তু শরীর ও সাংসারিক বিষয়ের প্রতি আসক্তি থাকায় এবং মন চঞ্চল

হওয়ার দরুন আপনার দয়া ব্যতীত পূর্ণরূপে শরণাগত হওয়া খুব কঠিন বলে মনে হয়।

ভ.—কঠিন বলে ধারণা করো, তাই কঠিন বলে মনে হচ্ছে। বাস্তবিক তা কঠিন নয়।

সা.—কঠিন নয় বলে মানব কী করে ? আমার তো কঠিন বলেই স্পষ্টত বোধ হয়।

ভ.—তোমার যদি তাই মনে হয়, তবুও তাতে কিছু আসে-যায় না, কিন্তু তোমার কেবল আমার কথার প্রতি মনোযোগ দেওয়া উচিত।

সা.—আজ থেকে আমি আপনার দয়ার ওপর ভরসা রেখে চেষ্টা করব, যাতে সেটা আমার কঠিন বলে বোধ না হয়। কিন্তু শুনেছি যে আপনার অতি অল্প নাম-জপ ও ধ্যানের দ্বারা সমস্ত পাপ নাশ হয়ে যায়। শাস্ত্র এবং আপনিও তো এমন কথাই বলেন, তাহলে বৃত্তিগুলির মলিন হওয়ার কারণ কী ? অল্প-বিস্তর ভজন-ধ্যান তো আমার দ্বারা হয়েই থাকে।

ভ.—এটা সত্যি যে ভজন-ধ্যানের দ্বারা সমস্ত পাপ নাশ হয়ে যায়, কিন্তু এতে কেউ বিশ্বাস করলে তবেই না ! তোমারও তো এতে পূর্ণ বিশ্বাস নেই ; কারণ তুমি ধরেই নিচ্ছ যে পাপসমূহ নাশ হয়নি, এখনও ওইভাবেই রয়ে গেছে।

সা.—বিশ্বাস না হওয়ার জন্য কারণ কী থাকতে পারে ?

ভ.—নীচ[১] এবং নাস্তিক ব্যক্তিদের[২] সঙ্গ, সঞ্চিত পাপ এবং দুর্গুণ।

সা.—পাপ এবং দুর্গুণ কি আলাদা বস্তু ?

ভ.—চুরি, ব্যভিচার, মিথ্যা বলা, হিংসা ও দম্ভ-ভণ্ডামি ইত্যাদি হচ্ছে পাপ এবং রাগ, দ্বেষ, কাম, ক্রোধ, দর্প, অহংকার ইত্যাদি হচ্ছে দুর্গুণ।

সা.—এ সমস্ত নাশ কী করে হবে ?

---

[১]মিথ্যা বলা, কপটতা, চুরি, ব্যভিচার, হিংসা ইত্যাদি শাস্ত্রবিরুদ্ধ কর্ম যারা করে, তাদের নীচ বলা হয়।

[২]ঈশ্বর এবং শ্রুতি, স্মৃতি ইত্যাদি শাস্ত্র যারা মানেন না, তাদের নাস্তিক বলা হয়।

ভ.—নিষ্কামভাবে ভজন, ধ্যান, সেবা এবং সৎসঙ্গ ইত্যাদি করা হল এ সমস্ত নাশ করার সবথেকে শ্রেষ্ঠ উপায়।

সা.—শুনেছি যে বৈরাগ্য হলেও নাকি রাগ-দ্বেষাদি দোষের নাশ হয়ে যায় এবং তার ফলে ভজন-ধ্যানের সাধনও ভালো হয়।

ভ.—এটা ঠিক যে বৈরাগ্য দ্বারা ভজন-ধ্যানের সাধন বৃদ্ধি পায়। কিন্তু অন্তঃকরণ শুদ্ধ না হলে তো দৃঢ় বৈরাগ্যও উৎপন্ন হয় না। যদি বলো যে শরীর এবং সাংসারিক ভোগের প্রতি দুঃখ এবং দোষ-বুদ্ধি স্থাপন করলেও বৈরাগ্য হতে পারে, তাও ঠিক কথা। কিন্তু এই অবস্থাও উপরোক্ত সাধন দ্বারাই সম্ভব হয়। অতএব ভজন, ধ্যান, সেবা এবং সৎসঙ্গ করার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করা উচিত।

● ● ●

সা.—ভগবান ! এখন এটা বলুন আপনি প্রত্যক্ষভাবে দর্শন কবে দেবেন ?

ভ.—এর জন্য তুমি কেন চিন্তা করছ ? যখন আমি সঠিক সময় বুঝব সেই মুহূর্তে দর্শন দেব। বৈদ্য যখন উচিত মনে করেন তখন নিজেই বিচার করে রোগীকে অন্নপথ্য দেন। রোগীর তো কেবল বৈদ্যর ওপর নির্ভর করা উচিত।

সা.—আপনার কথা তো ঠিকই। কিন্তু রোগীর যখন ক্ষুধা পায়, তখন সে 'আমি কবে খেতে পারব' এমন কথাই বলে। যে অন্নপথ্যের জন্য উদ্বিগ্ন হয়, তার তো এমন জিজ্ঞাসা করাই স্বাভাবিক।

ভ.—বৈদ্য জানেন যে রোগীর ক্ষুধা যথার্থ না অন্য কোনো উপসর্গ। রোগীর ক্ষুধা দেখেও যদি বৈদ্য তাকে অন্নপথ্য না দেন, তাহলে সেই না দেওয়ার মধ্যেও রোগীর নিশ্চয়ই মঙ্গল নিহিত আছে।

সাঃ.—ঠিক আছে, কিন্তু আপনার দর্শন না দেওয়ার মধ্যে কী মঙ্গল নিহিত আছে, তা আমি বুঝতে পারছি না। আমি তো দর্শন দেওয়ার মধ্যেই মঙ্গল দেখছি। খাদ্যবস্তুর দ্বারা তো অনিষ্ট হওয়াও সম্ভব, কিন্তু আপনার দর্শন দ্বারা কখনো অনিষ্ট হওয়া সম্ভব নয়, বরং পরম লাভ সাধিত হয়। এইজন্য আপনার দর্শন লাভ করা কখনো খাদ্যবস্তুর সদৃশ হতে পারে না।

ভ.—বৈদ্য যখন যে বস্তুর দ্বারা রোগীর আরোগ্য লাভ হবে বলে বুঝতে পারেন, তিনি রোগীকে উপযুক্ত সময় হলেই তা প্রদান করেন। এই ব্যাপারে তো রোগীর বৈদ্যর ওপরই নির্ভর করা উচিত। বৈদ্য প্রকৃত ক্ষুধা বুঝে রোগীকে খাবার খেতে দেন এবং তার দ্বারা ক্ষতিও হয় না। যদিও আমার দর্শন লাভ করা পরম লাভজনক, কিন্তু আমার প্রতি পূর্ণপ্রেম এবং শ্রদ্ধারূপ প্রকৃত ক্ষুধা না হলে আমার দর্শন লাভ করা সম্ভব নয়।

সা.—আমার মধ্যে তো শ্রদ্ধা এবং প্রেমের খুবই অভাব এবং তার পূরণ হওয়াও আমার খুব কঠিন বলে মনে হয়। সুতরাং আমার পক্ষে তো আপনার দর্শন পাওয়া অসাধ্য না হলেও কষ্টসাধ্য তো বটেই।

ভ.—এমন মনে করা তোমার খুবই ভুল, এবং এইরকম মনে হওয়ার জন্যই তো দর্শন হওয়াতে বিলম্ব হয়।

সা.—না মেনে কী করি ? কেমন করে না মানি ? পূর্ণ শ্রদ্ধা এবং প্রেম ব্যতীত দর্শন হওয়া তো সম্ভব নয় এবং আমার মধ্যে তার খুবই ঘাটতি আছে।

ভ.—ঘাটতির পূরণ কি হতে পারে না ?

সা.—হতে পারে, কিন্তু যেভাবে হয়ে আসছে, যদি ঠিক সেভাবেই হতে থাকে তাহলে এই জন্মে তো এর পূরণ হওয়া কখনো সম্ভব নয়।

ভ.—এরকম চিন্তা করে কেন তুমি নিজেই নিজের পথে বাধা সৃষ্টি করছ ? একশো বছরের কাজ কি এক মিনিটে হতে পারে না ?

সা.—হ্যাঁ, কেবলমাত্র আপনার কৃপায় তা সম্ভব হতে পারে।

ভ.—তাহলে এই হিসাব কেন করলে যে এই জন্মে এখন আর সম্ভব নয় ?

সা.— এটা আমার মূর্খতা, কিন্তু এখন আপনি এমন কৃপা করুন যার দ্বারা শীঘ্রই আপনার প্রতি পূর্ণ শ্রদ্ধা এবং অনন্য প্রেম হয়ে যায়।

ভ.—আমি কি চাই না যে আমার প্রতি তোমার পূর্ণ শ্রদ্ধা এবং প্রেম হোক ? এর মধ্যে কি আমি বাধার সৃষ্টি করব ?

সা.—এর মধ্যে বাধা সৃষ্টি করার কোনো প্রশ্ন নেই, বরং আপনি তো আমাকে সাহায্যই করেন। কিন্তু শ্রদ্ধা এবং প্রেমের পূরণ হতে বিলম্ব হচ্ছে, সেইজন্য আপনার কাছে এই প্রার্থনা করছি।

ভ.—ঠিক আছে। কিন্তু পূর্ণ প্রেম এবং শ্রদ্ধার যেটুকু ঘাটতি আছে, তা পূরণ করার জন্য আমার আশ্রয় নিয়ে ঐকান্তিক প্রচেষ্টা করা উচিত।

সা.—ভগবান ! আমি শুনেছি যে ক্রন্দনের দ্বারাও নাকি তা পূরণ করা যায়। এই কথাটি কি ঠিক ?

ভ.—সে ক্রন্দন ভিন্ন প্রকারের।

সা.—কী রকম ভিন্ন এবং তার স্বরূপ কেমন ?

ভ.— সে ক্রন্দন অন্তর থেকে হয় ; যেমন কোনো আর্ত-দুঃখী ব্যক্তি তার দুঃখ নিবৃত্তির জন্য প্রকৃতই অন্তর থেকে ক্রন্দন করে।

সা.—ঠিক আছে। আমিও তো সেরকমই চাই, কিন্তু সবসময় সেরকম ক্রন্দন হয় না।

ভ.—এর দ্বারা এটা নিশ্চিত হওয়া যায় যে বুদ্ধির বিচার দ্বারা তো তুমি ক্রন্দন করতে চাও, কিন্তু তোমার মন তা চায় না।

সা.—ভগবান ! যদি মন চাইত, তাহলে আবার আপনার কাছে প্রার্থনা করব কেন ? মন চায় না বলেই তো আপনার সাহায্য ভিক্ষা চাইছি।

ভ.—আমার আজ্ঞা পালনে তৎপর হলেই আমার পূর্ণ সাহায্য পাওয়া যায়। এই বিশ্বাস রেখো যে এতে তৎপর হলে কঠিন থেকে কঠিনতর কাজও সহজেই নিষ্পন্ন হতে পারে।

সা.—ভগবান ! আপনি যেমন বলছেন ঠিক তেমনই করব, কিন্তু আপনার কৃপাতেই তো সব হবে। আমি তো কেবল নিমিত্তমাত্র। এইজন্য আপনার এই আজ্ঞা শিরোধার্য করে আমি বিশেষভাবে চেষ্টা করব, এবং আমাকে নিমিত্ত করে যা কিছু করার আছে, তাই করিয়ে নিন।

ভ.— এইপ্রকার মেনে নেওয়ার দ্বারা তোমার মধ্যে যেন ছলনা বা শঠতাবুদ্ধির (কর্মের প্রতি অনীহা) উদয় না হয়।

সা.— ভগবান ! আপনার কাছে সাহায্য চাওয়াও কি শঠতার আশ্রয় নেওয়া (কর্মবিমুখতা) ?

ভ.—সাহায্য তো চাইতে থাকো, কিন্তু কাজ করার সময় মন ফাঁকি দিতে থাকে এবং আজ্ঞাপালনও করে না। এরই নাম শঠতা বা কর্মবিমুখতা। আমি যা কিছু বলেছি, আমাতে মন নিবিষ্ট করে সেই অনুযায়ী কেবল করতে থাকো। আগে-পরের কোনো চিন্তাই কোরো না। যা কিছু হবে, প্রসন্নতার

সঙ্গে দেখতে থাকো। এরই নাম শরণাগতি। এই বিশ্বাস রেখো যে এইপ্রকার শরণাগত হলে সকল কাজ সিদ্ধ হতে পারে।

সা.—বিশ্বাস তো করি, কিন্তু ব্যগ্রতার কারণে ভুল হয়ে যায় এবং পরমশান্তি ও পরমানন্দ প্রাপ্তিই যেন লক্ষ্যবস্তু হয়ে দাঁড়ায়।

ভ.— তুমি কাজের ফলের প্রতি যেমনভাবে নজর দাও, কাজের প্রতি তেমনভাবে নজর দাও না কেন ? আমার আজ্ঞানুসারে কাজ করলেই আমার প্রতি শ্রদ্ধা এবং প্রেম বৃদ্ধি হবে এবং আমাকে লাভ করা যাবে।

সা.—কিন্তু প্রভু ! আপনার প্রতি শ্রদ্ধা এবং প্রেম না হলে তো আজ্ঞাপালনও করা সম্ভব নয়।

ভ.—যতটুকু শ্রদ্ধা এবং প্রেম থাকলে আমার আজ্ঞাপালন হতে পারে, ততটুকু শ্রদ্ধা এবং প্রেম তো তোমার মধ্যে আছেই।

সা.—তাহলে আপনার আজ্ঞা অক্ষরে-অক্ষরে পালন না করতে পারার কারণ কী ?

ভ.—সঞ্চিত পাপ এবং রাগ (আসক্তি), দ্বেষ, কাম, ক্রোধাদি দুর্গুণই বাধা সৃষ্টির কারণ।

সা.—এদের নাশ কী করে হবে ?

ভ.—এটা তো আগেই তোমাকে জানিয়ে দিয়েছি। ভজন, ধ্যান, সেবা, সৎসঙ্গ ইত্যাদি সাধন দ্বারাই এদের নাশ হবে।

সা.— এর জন্য এখন থেকে আরও বিশেষভাবে প্রয়াস করব ; কিন্তু এরজন্যও তো আপনার সাহায্যই একান্ত সম্বল।

ভ.—আমার কাছে যতটা সাহায্য চাইবে, তা অবশ্যই পাবে।

● ● ●

সা.—প্রভু ! কেউ কেউ বলেন যে প্রভুর প্রত্যক্ষ দর্শন কেবল জ্ঞানচক্ষুর দ্বারাই হয়ে থাকে, চর্মচক্ষুর দ্বারা নয়—এই কথাটা কি ঠিক ?

ভ.—ওঁদের কথা ঠিক নয়। ভক্ত যেভাবে আমার দর্শন আকাঙ্ক্ষা করে, আমি সেভাবেই তাকে দর্শন দিতে পারি।

সা.—আপনার অবয়ব তো দিব্য, তাহলে চর্মচক্ষুর দ্বারা তার দর্শন কী করে হতে পারে ?

ভ.—আমার অনুগ্রহের দ্বারা হতে পারে। আমি তাকে এমন শক্তি প্রদান করি, যার দ্বারা সে চর্মচক্ষুর দ্বারাও আমার দিব্য স্বরূপের দর্শন লাভ করতে পারে।

সা.—যেখানে আপনি দিব্য সাকার স্বরূপে প্রকট হন, সেখানে যে সব মানুষ উপস্থিত থাকেন তাঁরা কি সকলেই আপনার দর্শন লাভ করেন, নাকি তাঁদের মধ্যে মাত্র দুই-একজনই দর্শন লাভ করেন ?

ভ.—এক্ষেত্রে আমি যেরকম ইচ্ছা করি, সেরকমই হয়ে থাকে।

সা.—চর্মদৃষ্টি তো সকলেরই সমান, তাহলে কারো দর্শন লাভ হয় আর কারো হয় না, এটা কেমন করে হয় ?

ভ.— এতে আশ্চর্যের কিছু নেই। একজন যোগীও তার যোগশক্তির দ্বারা এমন কাজ করতে পারে যার ফলে বহু লোকের সামনে দৃশ্যমান হলেও সে কিছু লোকের দৃষ্টিগোচর হয় আর কিছু লোকের হয় না।

সা.—যখন আপনি সকলের দৃষ্টিগোচর হন, তখন সকলে কি আপনাকে একইভাবে দর্শন করেন নাকি আলাদা-আলাদা ভাবে ?

ভ.—একভাবেও দর্শন দিতে পারি এবং আলাদা-আলাদা ভাবেও দিতে পারি। যে যেমন পাত্র অর্থাৎ আমার প্রতি যার যেরকম ভাবনা, প্রীতি এবং শ্রদ্ধা আছে, তাকে আমি সেরকমভাবেই দর্শন দিয়ে থাকি।

সা.—আপনি প্রত্যক্ষরূপে প্রকট হওয়ার পরেও দর্শনার্থীদের মধ্যে শ্রদ্ধার ন্যূনতা কেন থেকে যায় ? উদাহরণ দিয়ে বুঝিয়ে দিন।

ভ.—শ্রদ্ধার ন্যূনতা এবং অভাব হওয়া সত্ত্বেও আমি সকলের সামনে প্রকাশিত হতে পারি এবং প্রকাশিত হওয়ার পরেও শ্রদ্ধার কম-বেশি থাকতে পারে ; যেমন দুর্যোধনের সভায় আমি বিরাট-স্বরূপে প্রকট হয়েছিলাম এবং নিজ নিজ ভাবানুসারে লোকে আমাকে দেখতে পেয়েছিল আবার অনেকে আমাকে দেখতেও পায়নি।

সা.—যখন আপনি প্রত্যক্ষভাবে অবতার গ্রহণ করেন, তখন তো সকলের আপনাকে সমানভাবে দেখতে পাওয়া উচিত ?

ভ.—অবতার গ্রহণ করার সময়েও যার যেরকম ভাব থাকে, সেরকম ভাব অনুযায়ী সে আমাকে দেখে থাকে।[১]

সা.—অনেকে বলে থাকেন যে সচ্চিদানন্দঘন পরমাত্মা সাকাররূপে ভক্তের সামনে প্রকটিত হতে পারেন না। লোকেদের কাছে তো তাদের নিজস্ব ভাবই নিজ-নিজ ইষ্টদেবের সাকার বিগ্রহ ধারণ করে প্রকশিত হয়।

ভ.— তারা সব ভুল কথা বলে। তারা আমার সগুণ-স্বরূপের রহস্য জানে না। আমি স্বয়ং সচ্চিদানন্দঘন পরমাত্মা। নিজ যোগশক্তির দ্বারা দিব্য সগুণ-সাকাররূপে ভক্তের জন্য প্রকটিত হই। হ্যাঁ, সাধনকালে কোনো কোনো ব্যক্তির কাছে তো তাদের আপন-আপন ভাবই আমার দর্শনের মতো প্রতীত হয়ে থাকে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সেটা আমার দর্শন বলে মনে করা যাবে না।

সা.—সাধক কেমন করে বুঝবে যে তার প্রত্যক্ষ দর্শন হয়েছে, নাকি তা শুধু মনের ভাবনা ?

ভ.—প্রত্যক্ষ দর্শন এবং মনের ভাবনানুযায়ী দর্শনের মধ্যে তো রাত আর দিনের মতো তফাত রয়েছে। যখন আমার প্রত্যক্ষ দর্শন হয়, তখন তাঁর মধ্যে ভক্তের সমস্ত লক্ষণ প্রকাশিত হয় এবং সেই সময়ের সকল ঘটনাও প্রমাণিত হয়। যেমন ধ্রুব আমার প্রত্যক্ষ দর্শন লাভ করল, ফলে তার না পড়া সত্ত্বেও আমার শঙ্খের স্পর্শেই সমস্ত শাস্ত্রের জ্ঞান হয়ে গেল। প্রহ্লাদের কাছে আমি প্রত্যক্ষ প্রকটিত হয়েছিলাম এবং হিরণ্যকশিপু বধ হয়েছিল। এইসব ঘটনাবলী কেবলমাত্র ভাবনা অর্থাৎ মায়া দর্শনের দ্বারা সম্ভব নয়। যে ভাবনার দ্বারা আমার স্বরূপের প্রতীতি হয়, তার ঘটনাবলী এই প্রকার প্রমাণিত হয় না।

সা.—অনেকে বলেন যে ভগবান তো সর্বব্যাপী, সুতরাং তিনি বিশেষ কোনো একটি স্থানে কেমন করে প্রকট হতে পারেন ? এমন হলে কী আপনার সর্বব্যাপীত্বে দোষ স্পর্শ করে ?

ভ.—কখনোই নয়। অগ্নি যেমন সর্বব্যাপী। কিন্তু কেউ ইচ্ছা করলে উপযুক্ত মাধ্যমের দ্বারা অগ্নিকে কোনো একটি স্থানে অথবা একসঙ্গে অনেক

[১]জিনহ কেঁ রহী ভাবনা জ্যায়সী। প্রভু মুরতি তিন্‌হ দেখী ত্যায়সী॥

স্থানে প্রজ্বলিত করতে পারেন। সুতরাং অগ্নিদেব সর্বত্র বর্তমান থাকা সত্ত্বেও তাঁর সর্বশক্তিসহ বিশেষ কোনো একটি স্থানে অথবা অনেক স্থানে প্রকাশিত হতে সক্ষম। আমি তো অগ্নির চাইতেও অধিকতর ব্যাপ্ত এবং অপরিমিত শক্তিশালী। তাহলে আমার মতো সর্বব্যাপীর পক্ষে সব জায়গায় স্থিত হয়েও একসঙ্গে একটি অথবা অনেক জায়গায় সর্বশক্তিসহ প্রকট হওয়ার মধ্যে আশ্চর্যের কী আছে ?

সা.—আপনি নির্গুণ-নিরাকার হয়েও দিব্য সগুণ-সাকাররূপে কেমন করে প্রকট হন ?

ভ.—নির্মল আকাশে যেমন অণুরূপে জল থাকে। সেই জল বৃষ্টির সময় বিন্দুরূপে বর্ষিত হয় ; আবার কখনো সেই একই জল তার থেকেও স্থূলরূপ বরফ এবং শিলার আকারও ধারণ করে। তেমনই, আমি সৎ এবং অসতের অতীত হয়েও দিব্য জ্ঞানের দ্বারা শুদ্ধ সূক্ষ্ম বুদ্ধির দ্বারা জ্ঞাত হই। তদনন্তর আমি বিজ্ঞানানন্দ স্বরূপে স্থিত থেকেই নিজ যোগশক্তির দ্বারা যখন দিব্য প্রকাশ রূপে প্রকট হই তখন জ্যোতির্ময় রূপে যোগীদের হৃদয়ে দর্শন দিয়ে থাকি, আবার দিব্য প্রকাশরূপ হয়েই আমি দিব্য সগুণ-সাকাররূপে প্রকট হয়ে ভক্তদের দ্বারা প্রত্যক্ষভাবে দৃষ্ট হই—সূর্য যেমন প্রকট হয়ে সকলের চক্ষুতে স্ব প্রকাশ প্রদান করে নিজের দর্শন দিয়ে থাকে।

সা.—কেউ কেউ তো বলেন যে জল হল জড় বস্তু, তার মধ্যে এ ধরনের বিকার হওয়া সম্ভব ; কিন্তু নির্বিকার চেতনের মধ্যে এটা সম্ভব নয়।

ভ.—নির্বিকার চেতন স্বরূপ আমাতে এই বিকার নেই। এটা তো আমার শক্তির প্রভাব। আমি তো অসম্ভবকেও সম্ভব করতে পারি। আমার পক্ষে কিছুই অসম্ভব নয়।

সা.—আচ্ছা, এবারে বলুন আপনার সাক্ষাৎ দর্শন পাওয়ার সব থেকে শ্রেষ্ঠ উপায় কী ?

ভ.—আমার প্রতি অনন্য ভক্তি, অর্থাৎ আমার অনন্য শরণাগতি।

সা.—অনন্য ভক্তিদ্বারা কোন্ কোন্ লক্ষণের সঙ্গে যুক্ত হলে আপনাকে পাওয়া যায় ?

ভ.—দৈবী সম্পত্তির সমস্ত লক্ষণের সঙ্গে যুক্ত হলে আমাকে পাওয়া যায়। (গীতা ১৬।১ থেকে ৩ পর্যন্ত)।

সা.—দৈবী সম্পত্তির সমস্ত লক্ষণ প্রকাশ হলে তবেই কী আপনাকে পাওয়া যায়, নাকি তার আগেও পাওয়া যায় ?

ভ.—এমন কোনো বিশেষ নিয়ম নেই যে দৈবী সম্পত্তির সমস্ত গুণই থাকা চাই ; কিন্তু অনন্য ভক্তি অবশ্যই থাকা উচিত।

সা.—দৈবী সম্পত্তির গুণ কম থাকা সত্ত্বেও যদি কেবল অনন্য ভক্তিদ্বারা আপনাকে পাওয়া যায়, তাহলে তো আপনাকে পাওয়ার পর দৈবী সম্পত্তির সমস্ত লক্ষণ নিশ্চয় প্রকাশ পায় ?

ভ.—শুধু দৈবী সম্পত্তির সমস্ত লক্ষণই বা কেন, আরও অনেক বিশেষ বিশেষ গুণসকল প্রকাশ পায়।

সা.—সেই সমস্ত বিশেষ গুণ কী কী ?

ভ.—সমত্ব ইত্যাদি। (গীতা ১২।১৩ থেকে ২০ পর্যন্ত)

সা.—সেই সমস্ত লক্ষণ কী আপনাকে লাভ হওয়ার পরই শুধু প্রকাশ পায়, নাকি তার আগেও প্রকাশ পেতে পারে ?

ভ.—আগেও কিছু প্রকাশ পায়, কিন্তু আমাকে প্রাপ্ত হবার পর তা নিশ্চিতরূপে প্রকাশ পায়।

সা.—আপনাকে লাভ করতে হলে ভক্তের কর্তব্য কী হওয়া উচিত ?

ভ.—এটা তো আগেই বলেছি যে সর্বপ্রকারে কেবল আমার শরণাগত হওয়া উচিত।

সা.—শরণাগত হওয়ার বিষয়েও কেন আপনি স্বয়ং আপনার শরণাগত করে নেন না ?

ভ.—কাউকে জোর করে শরণাগত করে নেওয়া আমার কাজ নয়। শরণাগত হওয়া তো ভক্তের কর্তব্য।

সা.—এই বিষয়ে বিবেক-বিচার দ্বারা যে শরণাগত হতে চায়, তাকে কি আপনি সাহায্য করেন, নাকি করেন না ?

ভ.—যে সরল মনে সাহায্য চায়, তাকে অবশ্যই সাহায্য করে থাকি।

সা.—যে আপনাকে লাভ করার জন্য সমস্ত প্রকারে আপনার শরণাগত হতে চায়, তার সাধনায় কি ঋদ্ধি, সিদ্ধি, দেবতা ইত্যাদি বিঘ্ন সৃষ্টি করতে পারে, নাকি পারে না ?

ভ.—কেউই বিঘ্ন সৃষ্টি করতে পারে না।

সা. — প্রকৃতপক্ষে তো দেখতে পাওয়া যায় যে আপনার ভক্তদের অনেক বাধা-বিঘ্নের সম্মুখীন হতে হয় এবং তার ফলে তাদের সাধনায় প্রতিবন্ধকতাও সৃষ্টি হয়।

ভ.—এরা কায়মনোবাক্যে আমার শরণাগত হতে পারেনি।

সা.—আপনাকে প্রাপ্ত হওয়ার পর, ভক্তের মধ্যে কি অণিমাদি সিদ্ধিসকল প্রকাশ পায় ?

ভ.—ভক্তের কাছে তো এই সবের কোনো প্রয়োজনই থাকে না।

সা.—যদি ভক্ত ইচ্ছা করে, তাহলেও কি সে এইসব প্রাপ্ত করতে পারে, নাকি পারে না ?

ভ.—আমার ভক্ত এই সবের ইচ্ছা কখনো করে না ; এবং যদি করে, তাহলে সে আমার একনিষ্ঠ ভক্ত কখনো নয়।

সা.—আপনাকে লাভ করার পর আপনার ভক্তের কী ধরনের অধিকার হয় ?

ভ.—নিজের কোনোরকম অধিকার সে স্বীকার করে না এবং চায়ও না।

সা.—তার না চাওয়া সত্ত্বেও আপনি তো দিতে পারেন ?

ভ.—হ্যাঁ, প্রয়োজন মনে করলে দিয়ে থাকি।

সা.—আপনারও প্রয়োজন থাকে ?

ভ.—হ্যাঁ, সংসারে জীবের কল্যাণের জন্য ধর্ম এবং ভক্তি প্রচার করার যে প্রয়োজন আছে, সেটাই হল আমার প্রয়োজন।

সা.—সেই সময় আপনি তাকে কতটা অধিকার প্রদান করেন ?

ভ.—তাকে দিয়ে আমার কাজ করানোর জন্য যতটা প্রয়োজন হয়।

সা.—সব ভক্তকেই কি আপনি এই অধিকার দিতে পারেন, নাকি শুধু কাউকে কাউকে দিয়ে থাকেন ?

ভ.—উদাসীন ভক্তদের ব্যতীত যারা প্রসন্নতার সঙ্গে নিতে চায় তাদের সকলকে এই অধিকার দিতে পারি।

সা. —ধর্ম, সদাচার এবং ভক্তি প্রচার করার পূর্ণ অধিকার দেওয়ার যোগ্য বলে আপনি কাকে মনে করেন ? কেমন স্বভাবের ভক্তকে আপনি সম্পূর্ণ অধিকার দিতে পারেন ?

ভ.—যার স্বভাব হল অন্যের হিতের জন্য অনায়াসেই সর্বস্ব ত্যাগ করা,

প্রথম থেকেই যার অন্তরের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি হল সর্বদা সকলের কল্যাণ সাধন করা এবং অপরের প্রসন্নতাতেই যে সদা প্রসন্ন থাকে, এমন উদার স্বভাবের পরম দয়ালু প্রেমিক ভক্তকে আমি আমার পূর্ণ অধিকার দিতে পারি।

সা.—আপনাকে প্রাপ্ত হওয়ার পরেও কি সকলের ভাব একরকম হয় না ?

ভ.— না ; কারণ সাধনকালে যার যেমন স্বভাব থাকে, সিদ্ধাবস্থায়ও প্রায় তেমনই থাকে। কিন্তু হর্ষ, শোক, রাগ (আসক্তি), দ্বেষ, কাম, ক্রোধ ইত্যাদি বিকারের অত্যন্তাভাব সকলের মধ্যে হয়ে যায় এবং সমত্ব, শান্তি ও পরমানন্দের প্রাপ্তিও সকলের সমানভাবেই হয়, তথা শাস্ত্রবিরোধী কর্ম তো কারোর দ্বারাই হয় না। কিন্তু সমস্ত কর্ম (শাস্ত্রানুকূল কর্ম) আমার আজ্ঞানুসারে হলেও ভিন্ন-ভিন্ন রকমের হয়।

সা.—তাহলে তাদের বাইরের ক্রিয়াতে এইরূপ পার্থক্য হওয়ার কারণ কী ?

ভ.—কারো স্বভাব হল একান্তে বসে সাধন করা এবং কারো স্বভাব হল সেবা করা। স্বভাব, প্রারব্ধ এবং বুদ্ধি ভিন্ন-ভিন্ন হওয়ার দরুণ, তথা দেশ-কাল এবং পরিস্থিতির কারণেও বাইরের ক্রিয়া ভিন্ন-ভিন্ন হয়।

সা. — এইরূপ অবস্থাতে সব থেকে উত্তম তো সেই, যাকে আপনি সম্পূর্ণ অধিকার দিয়ে দিতে পারেন।

ভ. — এর মধ্যে উত্তম-মধ্যম কেউ নেই। সবাই উত্তম। যার স্বভাবে স্বাভাবিকই কাজ করার উৎসাহ বিশেষভাবে থাকে, তার উপর কাজের ভার বিশেষভাবে দেওয়া হয়।

সা. —আপনার দ্বারা নির্দিষ্ট কাজে তো সকলের উৎসাহ হওয়া উচিত।

ভ.—আমার দ্বারা নির্দিষ্ট কাজে তো সকলের উৎসাহ হয়, কিন্তু আমি তাদের স্বভাব অনুসারেই কাজের ভার দিয়ে থাকি। যার স্বভাব আমার কাছে থাকার, তাকে আমি বাইরে পাঠাই না। যার স্বভাব লোকসেবা করার, তার উপর লোকসেবার কাজ ন্যস্ত করি। যার মধ্যে বিশেষ উপরতির (তীব্র বৈরাগ্য) ভাব লক্ষ্য করি, তার উপর কাজ ন্যস্ত করি না। যার যেমন স্বভাব এবং যার যেরকম যোগ্যতা দেখি, সেই অনুযায়ী তার উপর কাজ ন্যস্ত করি।

সা.—কিন্তু ভক্তের তো এমন স্বভাব গঠন করা উচিত যাতে আপনি নিঃসঙ্কোচে তার উপর বিশেষ কাজ ন্যস্ত করতে পারেন। সুতরাং এই প্রকারের স্বভাব গঠন করার জন্য সবথেকে শ্রেষ্ঠ উপায় কী ?

ভ.—একমাত্র আমার (অনন্য-শরণ) শরণাগত হওয়া।

সা.—অনন্য-শরণ কাকে বলে ? দয়া করে বলে দিন।

ভ.—গুণ এবং প্রভাবসহ আমার নাম এবং রূপ একনিষ্ঠভাবে নিরন্তর চিন্তন করা, আমাকে স্মরণে রেখে কেবল আমার প্রীত্যর্থে আমার আজ্ঞা পালন করা এবং আমার বিধানে সর্বদা প্রসন্ন থাকা।

সা.—প্রভু ! আপনার ধ্যান (চিন্তন) করতে আমার ভালো লাগে, কিন্তু মন তো কিছুতেই স্থির হয় না। খুব তাড়াতাড়ি এখানে-সেখানে বিচরণ করে। এর কারণ কী ?

ভ.—আসক্তির কারণে মনে সংসারের বিষয়-ভোগ প্রিয় বোধ হয় এবং অনেক জন্মের যে সব পুঞ্জিভূত সংস্কার রয়েছে, তারা মনকে স্থির হতে দেয় না।

সা.—যার দ্বারা আমার কোনো প্রয়োজন সিদ্ধ হয় না এবং যার প্রতি আমার কোনো আসক্তি নেই, এইরূপ ব্যর্থ পদার্থের চিন্তন কেন হয় ?

ভ.—মন স্বাভাবিকই চঞ্চল হওয়ার দরুন ব্যর্থ পদার্থের চিন্তন তার অভ্যাসে পরিণত হয়েছে। অধিকন্তু, এই ধরনের চিন্তন তার কাছে রুচিকর বলেও প্রতিপন্ন হয়ে থাকে। এটাও এক প্রকারের আসক্তি। এইজন্য সে এই সমস্ত ব্যর্থ পদার্থের চিন্তন করে থাকে।

সা.—এর জন্য কী করা উচিত ?

ভ.— মনকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে হবে যাতে সে আমার স্বরূপের ধ্যান ছেড়ে অন্য কোনো পদার্থের চিন্তন না করতে পারে। এরপরও যদি সে অন্য পদার্থের চিন্তন করতে থাকে, তাহলে তৎক্ষণাৎ তাকে বুঝিয়ে অথবা বলপূর্বক সেখান থেকে সরিয়ে নিয়ে তৎপরতার সঙ্গে আমার ধ্যানে লাগানোর চেষ্টা পুনঃপুন করা উচিত।

সা.—মনকে অন্য পদার্থের থেকে কী করে সরানো যাবে ?

ভ.— যেমন কোনো ছোট শিশু হাতে ছুরি অথবা কাঁচি নিলে তার মা তাকে বুঝিয়ে হাত থেকে কেড়ে নেয়। যদি মূর্খতার কারণে শিশুটি ছাড়তে

না চায় তাহলে মা তার কান্না গ্রাহ্য না করে জোর করে কেড়ে নেয়। তেমনই এই মনকে বুঝিয়ে অন্য পদার্থের চিন্তন করা থেকে নিরস্ত করা উচিত, কারণ এই মনও তো বালকের মতো চঞ্চল। হানিকর পরিণামের বিচার সে করে না।

সা.—মন যে প্রতারণা করে কখন এবং কোথায় কোন্ বস্তুকে চুপচাপ গিয়ে ধরে ফেলে, তা তো টের পাওয়াই যায় না। এর জন্য কী করা উচিত ?

ভ.— মা যেমন সন্তানের প্রতি সর্বদা লক্ষ্য রাখে, মনের প্রতি ঠিক তেমনই নজর রাখা উচিত।

সা.—মন খুবই চঞ্চল, বলবান এবং উদ্দণ্ড হওয়ার দরুন তাকে আটকানো খুব কঠিন বলে মনে হয়।

ভ.—কঠিন তো বটেই, তবে যতটা কঠিন তুমি মনে করো ততটা নয় ; কারণ তাকে প্রযত্ন দ্বারা আটকানো যেতে পারে। সুতরাং এটা কঠিন মনে করে নিরাশ হওয়া উচিত নয়। মা কখনো সন্তানের রক্ষণাবেক্ষণ করাকে কঠিন বলে মনে করেন না। যদি কঠিন বলে মনে করেন, তাহলে সন্তানের পালন কেমন করে হবে ?

সা.—মন কী সবসময় শিশুর ন্যায় আচরণ করে ?

ভ.—না, শিশুর থেকেও অধিক বলবান এবং জেদি।

সা.—তাহলে এর নিগ্রহ কেমন করে সম্ভব ?

ভ.— নিগ্রহ করা সম্ভব, কারণ মনের থেকে বুদ্ধি বলবান এবং বুদ্ধির থেকেও তুমি স্বয়ং অত্যন্ত বলবান। এই জন্য মা যেমন তাঁর বুদ্ধিমতী মেয়ের দ্বারা তাঁর ছোট শিশুকে বুঝিয়ে বা লোভ দেখিয়ে এবং যদি সে অবাধ্য হয় তাহলে ভয় দেখিয়েও তাকে অনিষ্টের হাত থেকে বাঁচিয়ে তার মঙ্গল সাধন করেন, ঠিক তেমনই বুদ্ধির দ্বারা মনকে ভোগের বিষয়ে ভয় দেখিয়ে তাকে এই বিনাশশীল এবং ক্ষণভঙ্গুর সাংসারিক পদার্থের থেকে সরিয়ে নিয়ে পুনঃপুন আমাতে লাগানো উচিত।

সা. —এই প্রকার চেষ্টা করার পরও তো আমি নিজের বিজয় দেখছি না।

ভ. — যদি বিজয় না হয় তাহলেও দৃঢ় থাকো, হতাশ হয়ো না। যখন আমার সহায়তা আছে, তখন নিরাশ হওয়ার কোনো কারণ নেই। এই

বিশ্বাস রাখো যে লড়াই করতে করতে অবশেষে তোমার বিজয় একেবারে নিশ্চিত।

সা.—প্রভু ! যখন আমি আপনার ধ্যান করার জন্য একান্তে গিয়ে বসি, তখন নিদ্রা, আলস্য এসে বিরক্ত করতে থাকে। এখন বলুন, এর জন্য কী করা উচিত ?

ভ.—হাল্কা (লঘু) এবং সাত্ত্বিক ভোজন করা উচিত। শরীরকে স্থির ও সোজা রেখে এবং চোখের দৃষ্টি নাসিকার অগ্রভাগে নিবদ্ধ করে পদ্মাসন অথবা স্বস্তিকাদি—কোনো একটি আসনে সুখপূর্বক উপবেশন করে দিব্য স্তোত্রের দ্বারা আমার স্তুতি-প্রার্থনা করা উচিত এবং আমার নাম, রূপ, গুণ, লীলা, প্রভাবাদি, যা তুমি মহাপুরুষদের কাছ থেকে শুনেছ অথবা শাস্ত্রে পড়েছ, সে সব বারংবার কীর্তন এবং মনন করা উচিত। এইরকম করলে সাত্ত্বিক ভাব উৎপন্ন হয়ে বুদ্ধি জাগ্রত হয়, যার ফলে তমোগুণের কার্য নিদ্রা এবং আলস্য আসতে পারে না।

সা.—ভগবান ! আপনি গীতাতে বলেছেন যে 'আমাকে সর্বদা নিরন্তর চিন্তন করলে আমার প্রাপ্তি সুলভ হয়, কারণ আমি কৃত সাধনের রক্ষা এবং ন্যূনতার পূর্তি করে খুব শীঘ্র তাকে সংসার সাগর থেকে উদ্ধার করে থাকি।' কিন্তু আপনি আপনার প্রাপ্তি যতটা সুলভ এবং শীঘ্রতার সঙ্গে হবে বলে জানিয়েছেন, সেরকম তো আমার মনে হয় না।

ভ.—আমার নিত্য-নিরন্তর চিন্তন তোমার দ্বারা হয় না, সেইজন্য আমার প্রাপ্তি তোমার কঠিন বলে মনে হয়।

সা.—আপনি যথার্থ বলেছেন। আপনার নিরন্তর চিন্তন হলে অবশ্য আপনার প্রাপ্তি শীঘ্র এবং সুগম হয় ; কিন্তু নিরন্তর আপনার চিন্তন হওয়া তো কঠিন। এর জন্য কী করা উচিত ?

ভ.—আমার গুণ, প্রভাব, তত্ত্ব এবং রহস্য না জানার ফলে নিরন্তর আমার চিন্তন কঠিন বলে প্রতীত হয়। বাস্তবিক তা কঠিন নয়।

সা.—আপনার গুণ, প্রভাব, তত্ত্ব এবং রহস্য কী ? আমাকে বলুন।

ভ.—অতিশয় সততা, শান্তি, দয়া, প্রেম, ক্ষমা, মাধুর্য, বাৎসল্য, গাম্ভীর্য, ঔদার্য, সৌহার্দ্য ইত্যাদি হচ্ছে আমার গুণ। সম্পূর্ণ বিভূতি, বল, ঐশ্বর্য, তেজ, শক্তি, সামর্থ্য এবং অসম্ভবকেও সম্ভব করা ইত্যাদি হচ্ছে

আমার প্রভাব। যেমন জলের অণু, বাষ্প, বৃষ্টি, জলবিন্দু এবং বরফ ইত্যাদি সব জলেরই নামান্তর, ঠিক তেমনি সগুণ-নির্গুণ, সাকার-নিরাকার, ব্যক্ত-অব্যক্ত, জড়-চেতন, স্থাবর-জঙ্গম, সৎ-অসৎ ইত্যাদি যা কিছু আছে এবং এসবের অতিরিক্তও যা কিছু আছে, সে সমস্ত তো আমিই। এটা আমার তত্ত্ব। আমার দর্শন, ভাষণ, স্পর্শ, চিন্তন, কীর্তন, অর্চন, বন্দন, স্তবন ইত্যাদির দ্বারা পাপীও পরম পবিত্র হয়ে যায়, এই বিশ্বাস রাখা এবং সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান, সর্বত্র সমভাবে স্থিত হয়েও আমি যে মনুষ্যাদি শরীরে প্রকট হই এবং অবতার রূপ গ্রহণ করি, এইভাবে আমাকে চেনাই হল আমার রহস্য জানা।

সা.—এই সবকিছু কী করে জানা যাবে ?

ভ.—যেমন ছোট শিশু লেখাপড়া শেখার আরম্ভে লেখাপড়া করার প্রতি বিমুখ হয়, কিন্তু লেখাপড়া করতে করতে যখন লেখাপড়ার গুণ, প্রভাব, তত্ত্ব এবং রহস্য জেনে যায় তখন খুব আনন্দ এবং উৎসাহের সঙ্গে লেখাপড়া করতে থাকে এবং অন্য কেউ ছাড়াতে চাইলেও ছাড়তে চায় না, তেমনি সৎসঙ্গের প্রভাবে আমার ভজন, ধ্যান ইত্যাদি সাধন করতে করতে মানুষ যখন আমার গুণ, প্রভাব, রহস্য সম্বন্ধে অবগত হয়, তখন সে এমন আনন্দ এবং শান্তি লাভ করে যে এসব থেকে কেউ ছাড়াতে চাইলেও সে ছাড়তে পারে না।

সা.—প্রভু ! আপনার নিরন্তর চিন্তন করতে করতে, আপনার আজ্ঞানুসারে, শরীর এবং ইন্দ্রিয়ের দ্বারা জীবিকা অর্জনের কাজও কী সম্ভব হতে পারে ?

ভ.—কঠোর অভ্যাসের দ্বারা হতে পারে। যেমন কচ্ছপ তার ডিমের প্রতি, গোরু তার ছোট শাবকের প্রতি, কামুক ব্যক্তি স্ত্রীর প্রতি, লোভী ব্যক্তি অর্থের প্রতি, মোটর চালক রাস্তার প্রতি, নটী তার পায়ের প্রতি লক্ষ্য রেখে নিজের শরীর এবং ইন্দ্রিয়ের দ্বারা সব রকম কর্ম সম্পাদন করে থাকে ; তেমনিভাবে আমার নিরন্তর চিন্তন করতে করতে আমার আজ্ঞানুসারে শরীর এবং ইন্দ্রিয়ের দ্বারা সমস্ত রকমের কাজ করাও সম্ভব হতে পারে।

সা.—আপনার আজ্ঞা কী ?

ভ. —সৎ-শাস্ত্র, মহাপুরুষদের বাণী, হৃদয়ের সাত্ত্বিক স্ফূরণ—এই তিনটি হল আমার আজ্ঞা। এই তিনটির মধ্যে মতভেদ দেখা গেলে যেখানে দুটির মধ্যে ঐক্য থাকবে সেটাকেই আমার আজ্ঞা মনে করে সেই অনুযায়ী কাজ করা উচিত।

সা.—যেখানে তিনটির মধ্যে ভিন্ন-ভিন্ন মত দেখা যায় সেখানে কী করা উচিত ?

ভ.—সেক্ষেত্রে মহাপুরুষের আজ্ঞা পালন করা উচিত।

সা.—এর দ্বারা কী শাস্ত্রের অবহেলা করা হবে না ?

ভ.— না, কারণ মহাপুরুষ শাস্ত্রের বিপরীত কথা বলতে পারেন না। সর্বসাধারণের পক্ষে শাস্ত্রের নির্ণয় করা কঠিন এবং মহাত্মারাই শাস্ত্রের যথার্থ তাৎপর্য দেশ এবং কাল অনুসারে জানতে সক্ষম হন। এইজন্য মহাপুরুষগণ যে পথ নির্দেশ করেন সেটাই যথার্থ।

সা.—যদি কেবল হৃদয়ের সাত্ত্বিক স্ফূরণকেই ভগবৎ-আজ্ঞা বলে মেনে নেওয়া হয় তাহলে আপত্তি কোথায় ?

ভ.—মেনে নিতে পারো। কিন্তু সেইসব স্ফূরণ শাস্ত্র এবং মহাপুরুষ বর্ণিত বাক্যের অনুকূল হওয়া উচিত। কারণ সাধকের জন্য শাসনের আবশ্যকতা আছে, নতুবা অজ্ঞানবশত কখনো রাজসিক, তামসিক স্ফূরণকে সাত্ত্বিক বলে মেনে নিলে সাধকের মধ্যে উচ্ছৃঙ্খলতা প্রবেশ করে তার পতন ঘটাতে পারে।

সা.—এখানে শাস্ত্র বলতে আপনি কী বোঝাতে চেয়েছেন ?

ভ.—শ্রুতি, স্মৃতি, ইতিহাস, পুরাণাদি যে সব আর্যগ্রন্থ আছে, তা সবই হল শাস্ত্র। কিন্তু এখানেও মতভেদ দেখা গেলে শ্রুতিকেই গুরুত্ব দেওয়া উচিত ; কারণ স্মৃতি, ইতিহাস, পুরাণাদির আধার হল শ্রুতিই।

সা.—সাধারণ মানুষের পক্ষে তো শ্রুতি, স্মৃতি ইত্যাদি সমস্ত শাস্ত্রের জ্ঞান লাভ করা কঠিন। এমন অবস্থায় তাদের কীসের আশ্রয় নেওয়া উচিত ?

ভ.—তাদের শাস্ত্রজ্ঞ মহাপুরুষের আশ্রয় নেওয়া উচিত।

সা.—মহাপুরুষ বলে কাকে মানা উচিত ?

ভ.—যাঁকে তুমি নিজের অন্তর থেকে সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ বলে স্বীকার করো, তিনিই তোমার কাছে মহাপুরুষ।

সা.—প্রভু ! আমার স্বীকৃতি ভুল হলে তো তার দরুন আমি প্রতারিতও হতে পারি।

ভ.—তার জন্য কোনো চিন্তা নেই। আমার আশ্রিতজনকে আমি স্বয়ং সমস্ত প্রকারে রক্ষা করে থাকি।

সা.—প্রভু ! আমি কোন্ মানদণ্ড দিয়ে মহাপুরুষের বিচার করব ? মহাপুরুষের লক্ষণ কী ?

ভ.—গীতার দ্বিতীয় অধ্যায়ের ৫৫ থেকে ৭১ শ্লোক পর্যন্ত স্থিতপ্রজ্ঞ নামে, অথবা ষষ্ঠ অধ্যায়ের ৭ থেকে ৯ শ্লোক পর্যন্ত যোগী নামে, অথবা দ্বাদশ অধ্যায়ের ১৩ থেকে ১৯ শ্লোক পর্যন্ত ভক্ত নামে, অথবা চতুর্দশ অধ্যায়ের ২২ থেকে ২৫ শ্লোক পর্যন্ত গুণাতীত নামে বর্ণিত লক্ষণ যাঁর মধ্যে আছে, তিনিই মহাপুরুষ।

সা.—এমন মহাপুরুষ পাওয়া তো কঠিন ; সুতরাং এই পরিস্থিতিতে কী করা উচিত ?

ভ.—এমন অবস্থায় সকলের পক্ষে সহজ-বোধগম্য এবং সুগম সর্বশাস্ত্রময়ী গীতাকেই আশ্রয় করা উচিত, যা অর্জুনকে উদ্দেশ্য করে আমি বলেছিলাম।

সা.—প্রধানত গীতার কোন্ কোন্ শ্লোক অনুযায়ী সাধক নিজের গুণ এবং আচরণ গড়ে তুলবেন ?

ভ.—এর জন্য গীতায় অনেক শ্লোক আছে। তার মধ্যে বিশেষভাবে 'জ্ঞান' নামে বর্ণিত ত্রয়োদশ অধ্যায়ের ৭ থেকে ১১ শ্লোক, অথবা 'দৈবী সম্পত্তি' নামে বর্ণিত ষোড়শ অধ্যায়ের ১ থেকে ৩ শ্লোক, অথবা 'তপ' নামে বর্ণিত সপ্তদশ অধ্যায়ের ১৪ থেকে ১৭ শ্লোক অনুযায়ী নিজের জীবন গঠন করা উচিত।

সা.— প্রভু ! আপনি বলেছেন যে আপনার সৃষ্ট বিধানে সর্বদা প্রসন্ন থাকা উচিত। এখন এর অর্থ কী, তা বলে দিন।

ভ.— সুখ-দুঃখ, লাভ-ক্ষতি, প্রিয়-অপ্রিয় ইত্যাদির প্রাপ্তিরূপ আমার সৃষ্ট বিধানকে আমার পাঠানো পুরস্কার মেনে নিয়ে সর্বদা সন্তুষ্ট থাকা উচিত।

সা.—এই সব প্রাপ্ত হলে তো সর্বদা প্রসন্ন থাকা যায় না। এর কারণ কী ?

ভ.—আমার প্রত্যেক বিধানের মধ্যে যে পূর্ণরূপে দয়া নিহিত আছে, তার তত্ত্ব এবং রহস্য সম্বন্ধে লোকে অবগত নয়।

সা.—স্ত্রী, পুত্র, অর্থ, গৃহ ইত্যাদি সাংসারিক সুখদায়ক পদার্থ তো মোহ এবং আসক্তির দ্বারা মানুষকে আবদ্ধ করে। আপনি এই সব তাহলে কী জন্য প্রদান করেন ? এবং এই বিধানের মধ্যে আপনার দয়ার রহস্য জানা, এর অর্থ কী ?

ভ.—যেমন কোনো রাজা তাঁর অনুগত অধিকারীকে তাঁর কাছে শীঘ্র নিয়ে আসার জন্য মোটরগাড়ি পাঠিয়ে দেন, তেমনিই আমি পূর্বকৃত পুণ্যের ফলস্বরূপ স্ত্রী, পুত্র, অর্থ, গৃহ ইত্যাদি সাংসারিক পদার্থ অপরকে সুখ প্রদান করার জন্য এবং সদাচার, সদ্‌গুণের দ্বারা আমার প্রতি প্রেম বৃদ্ধি করে আমার কাছে শীঘ্র আসার জন্য প্রদান করে থাকি। এই প্রকার অনুধাবন করাই হল আমার দয়ার রহস্যকে জানা।

সা.—স্ত্রী, পুত্র, ধনাদি সাংসারিক পদার্থের বিনাশের মধ্যে আপনার দয়ার তত্ত্ব এবং রহস্য কী থাকতে পারে ?

ভ.—যেমন পতঙ্গাদি প্রদীপের শিখা জ্বলতে দেখে মোহ এবং আসক্তির কারণে জ্বলন্ত শিখার মধ্যে পড়ে ভস্ম হয়ে যায় এবং তাদের এই দুর্দশা দেখে কোনো দয়ালু ব্যক্তি সেই জ্বলন্ত শিখা নির্বাপিত করে দেন—এর দ্বারা যদিও সেই পতঙ্গাদি তাদের দুঃখ-কষ্ট লাঘবের কথা জানতে পারে না, তথাপি তাদের প্রতি দয়াপরবশ হয়েই সেই ব্যক্তি এরূপ করে থাকেন। ঠিক এমনিভাবেই মানুষকে ভোগ এবং আসক্তির দ্বারা আবদ্ধ করে নরকে নিক্ষেপকারী এই সমস্ত পদার্থ বিনাশ করার মধ্যেও আমার মহান দয়া নিহিত আছে বলে বোঝা উচিত।

সা.—আপনি মানুষকে আরোগ্য, বল এবং বুদ্ধি ইত্যাদি কীসের জন্য দিয়েছেন ?

ভ.—সৎসঙ্গ, সেবা এবং নিরন্তর ভজন-ধ্যানের অভ্যাস দ্বারা আমার গুণ, প্রভাব, তত্ত্ব ও রহস্যকে বোঝার জন্য।

সা.—ব্যাধি এবং সংকট ইত্যাদিতে আপনার দয়ার দর্শন কেমন করে করব ?

ভ.—ব্যাধি এবং সংকট ইত্যাদির ভোগ দ্বারা পূর্বকৃত পাপরূপ ঋণ

থেকে মুক্তি এবং দুঃখ অনুভব হওয়ার দরুন ভবিষ্যতে পাপ করতে গেলে বাধার সৃষ্টি হয়। মৃত্যুভয় বজায় থাকলে শরীরের প্রতি বৈরাগ্য হয়ে আমার স্মৃতি জাগরিত হয়। অধিকন্তু, যদি ব্যাধিকে পরম তপ বুঝে নিয়ে সেবন করা হয় তাহলে তার দ্বারা আমার প্রাপ্তিও হতে পারে। এইপ্রকার অনুধাবন করতে পারাই হল আমার দয়া দর্শন করা।

সা.—মহাপুরুষের প্রাপ্তিতে দয়া প্রত্যক্ষভাবে আছে, কিন্তু তাঁদের বিয়োগের মধ্যে আপনার দয়া কেমন করে বোঝা যাবে ?

ভ.—প্রকাশকে সরানো হলেই মানুষ প্রকাশের মহত্ত্বকে অনুধাবন করতে পারে। এইজন্য মহাপুরুষের সঙ্গে পুনঃ মিলিত হবার তীব্র ইচ্ছা উৎপন্ন করার এবং তাঁর প্রতি প্রেম বৃদ্ধি করার জন্য এবং মহাপুরুষের প্রাপ্তি যে দুর্লভ এবং মহত্ত্বপূর্ণ, এই কথাটা অনুভব করার জন্যই আমি তাঁর বিয়োগ ঘটিয়ে থাকি—এমন বোঝা উচিত।

সা.—কুসঙ্গের দোষ থেকে বাঁচানোর জন্য আপনি দুষ্ট দুরাচারী ব্যক্তিদের বিয়োগ ঘটিয়ে থাকেন, এর মধ্যে তো আপনার দয়া প্রত্যক্ষভাবে আছে ; কিন্তু ইচ্ছা না থাকা সত্ত্বেও আপনি তাদের সঙ্গ কেন প্রদান করেন ?

ভ.—দুরাচারের কারণে সম্ভাবনীয় ক্ষতির দিগ্‌দর্শন করিয়ে দুর্গুণ এবং দুরাচারের প্রতি বৈরাগ্য উৎপন্ন করার জন্যই আমি এমন ব্যক্তিদের সঙ্গ প্রদান করি। কিন্তু স্মরণে রাখা উচিত, যে ব্যক্তি জেনেবুঝে কুসঙ্গ করে, তা কিন্তু আমার প্রদান করা কখনো নয়।

সা.—সর্বসাধারণের সঙ্গে সংযোগ এবং বিয়োগ ঘটার মধ্যে আপনার দয়া কেমন করে প্রত্যক্ষ করব ?

ভ.—সর্বসাধারণের প্রতি দয়া এবং প্রেমপূর্বক তাদের সেবা করার জন্য সংযোগ এবং তাদের প্রতি বৈরাগ্য উৎপন্ন করে একান্তে বাস করে নিরন্তর ভজন-ধ্যান সাধন করার জন্যই সর্বসাধারণের সঙ্গে বিয়োগ ঘটিয়ে থাকি। এরূপ অনুধাবন করাই হল আমার দয়া প্রত্যক্ষ করা।

সা.— নীতি-ধর্ম এবং ভজন-ধ্যানে বাধা সৃষ্টিকারী মামলা-মোকদ্দমা ইত্যাদি জটিলতার মধ্যে আপনার দয়ার অনুভব কেমন করে করব ?

ভ.—নীতি-ধর্ম, ভজন-ধ্যান ইত্যাদিতে কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ,

ভয় এবং দুর্বলতার কারণেই বাধার সৃষ্টি হয়। যে ব্যক্তি ন্যায়সম্মতভাবে প্রাপ্ত মোকদ্দমা ইত্যাদি ঝঞ্ঝাটকে আমার পাঠানো পুরস্কার মনে করে নীতি এবং ধর্ম ইত্যাদিতে অটল থাকে ; তার মধ্যে আত্মবল বর্ধনকারী ধৈর্য, বীর্য, গাম্ভীর্য ইত্যাদি গুণের বৃদ্ধি হয়। এটা অনুধাবন করতে পারাই হল আমার দয়া অনুভব করা।

সা.—ভক্তের মান, দম্ভ, প্রতিষ্ঠা ইত্যাদি আপনি কেন হরণ করে থাকেন ? এর রহস্য কী ?

ভ.—অজ্ঞানরূপ নিদ্রা থেকে জাগাতে এবং সাধনের প্রতিবন্ধকতা দূর করতে, অধিকন্তু দম্ভকে অপসারিত করে প্রকৃত ভক্তি বৃদ্ধির জন্য, আমি মান, দম্ভ, প্রতিষ্ঠা ইত্যাদি হরণ করে থাকি। এটাই হল রহস্য।

সা.—আপনার বিশেষ দয়া কী ?

ভ.—আমার ভজন, ধ্যান, সেবা, সৎসঙ্গ, সদ্‌গুণ এবং সদাচার ইত্যাদির যে স্মৃতি, ইচ্ছা এবং তা লাভ করা—এটাই তো আমার বিশেষ দয়া।

সা.—তাহলে তো কর্ম অনুসারে আপনার দ্বারা কৃত এইসব বিধানকে আপনার পাঠানো পুরস্কার বলে মেনে নিয়ে প্রতিক্ষণে মুগ্ধ হওয়া উচিত !

ভ.—এ-কথা যথার্থ, কিন্তু লোকে বুঝতে পারে কই !

সা.—বোঝার জন্য কী করা উচিত ?

ভ.—গুণ এবং প্রভাবের সহিত অনন্যচিত্তে আমার নাম-রূপের নিরন্তর চিন্তন এবং এইরূপ চিন্তন রেখেই আমার আজ্ঞা অনুসারে নিষ্কামভাবে কর্মের অনুষ্ঠান, এবং আমার দয়ার রহস্য যে মহাপুরুষ জানেন, তাঁর সঙ্গ করা উচিত।

———o———